প্রথম অধ্যায়

এক

রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের এক দশকের মধ্যে যে গুটিকয় ব্যতিক্রমী সাহিত্য প্রতিভার প্রকাশ ঘটেছিল, যাঁরা নিজেদের এবং সমাজ-জীবনের ভাঙা-গড়ার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে বাংলা কথাসাহিত্যকে নতুনতর ব্যঞ্জনায় ভরিয়ে তুলেছিলেন, সুবোধ ঘোষ তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য। বিষয়ভাবনা ও প্রকরণে সুবোধ ঘোষের স্বতন্ত্রতা সন্ধানের প্রাক্কালে প্রাসঙ্গিকভাবেই বাংলা কথাসাহিত্যের পটভূমি ও পরিপ্রেক্ষিত আলোচিত হওয়া প্রয়োজন।

বাংলা কথাসাহিত্য তার সৃষ্টিকাল থেকে এ যাবৎকাল পর্যন্ত পর্বে পর্বে অর্জন করেছে বহু নতুনত্ব। এই নতুনত্বের নানাদিক সময়ের প্রবহমানতার সঙ্গে সৃষ্টিচৈতন্যের নানা প্রান্তকে উন্মোচিত করেছে নিপুণ কুশলতায়। বিষয় ভাবনা, প্রকরণ চিন্তা, বয়ন পদ্ধতি, চরিত্র-চিত্রণ পর্বে পর্বে আমূল পরিবর্তিত হয়েছে বিশ শতকের শুরুতে অনুভূত বাঙালি জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতের অনিবার্য ফলশ্রুতি হিসেবে।

আমরা জেনেছি ঊনিশ শতক পাশ্চাত্য রেনেসাঁসে উজ্জীবিত। সে সময়ের বাংলা কথাসাহিত্যিকদের রচনার মূল প্রেরণা সমাজ-সংস্কার প্রয়াস। সমাজের শুভাশুভবোধ। অবশ্য পশ্চিমী সাহিত্যের শিক্ষা ও সংস্কৃতির নতুন অভিজ্ঞতা থেকে তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন এই পরিকল্পনা। কিন্তু দুর্ভাগ্যময় বাংলাদেশের সমাজ-সংস্কৃতি ও অর্থনীতির বিচারে এটাই প্রতীয়মান হয় যে কথাসাহিত্য রচনার উপযুক্ত পরিবেশ ও পরিপ্রেক্ষিত তখন ছিল না। সে সময়ে বাংলাদেশের সামন্ততান্ত্রিক প্রথায় গভীরভাবে জারিত সমাজ ছিল পুরোপুরি অগ্রসরহীন। এক সুগঠিত মধ্যবিত্ত নাগরিক সমাজ, যা কথাসাহিত্য সৃষ্টির উপযোগী দৃঢ় ভিত্তি রচনা করতে পারে, তখন তা ছিল অনুপস্থিত। বাংলাদেশের তৎকালীন সময় কথাসাহিত্য রচনার জন্য প্রয়োজনীয় প্রেরণার যোগান দিতে অসমর্থ হয়। তবুও এরই মধ্যে প্যারীচাঁদ মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ মনীষীদের রচনায় বাংলা কথাসাহিত্য এক স্থায়ী মর্যাদার রূপ নিতে শুরু করে।

প্যারীচাঁদ মিত্র ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে 'আলালের ঘরের দুলাল' লিখে কথাসাহিত্যের প্রাক্‌কথন স্থাপিত করলেও সে সময় তাঁর পক্ষে সার্থক কথাসাহিত্য রচনা করা ছিল প্রায় দুরূহ। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রাজ্ঞ মনীষায়, এক অপ্রতিহত পূর্ণব্যক্তিত্বময় অভিজ্ঞতায়, নবাগত নবজাগরণকে নীলকন্ঠরূপে আত্মস্থ করে যে কথাসাহিত্য রচনা করেন তা বাংলা কথাসাহিত্যের সার্থক সৃষ্টিভ্রূণ হিসেবে চিহ্নিত হ'ল। আমরা পেলাম 'দুর্গেশনন্দিনী'।

ঊনিশ শতকে বঙ্কিমচন্দ্রের অসম্ভব ক্ষমতাপূর্ণ ব্যক্তিত্বের ঢেউয়ে অগ্রগমন ঘটে বাংলা কথাসাহিত্যের। বঙ্কিমচন্দ্র নিজস্ব কালচেতনায় নবজাত কথাসাহিত্যে এক জোয়ারের সৃষ্টি করেন, রবীন্দ্রনাথ তাকে পুষ্ট ও পরিবর্ধিত করেন এবং স্বতন্ত্র চরিত্র দান করেন। বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ এই দুই ব্যক্তিত্বের কথাসাহিত্য সৃষ্টির জোয়ার-প্রতিজোয়ারে বাংলা কথাসাহিত্য এসে দাঁড়ায় বিশ শতকের প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৮) সমসময়ে বা সামান্য পরেই - কল্লোলের কালে।

বঙ্কিমচন্দ্রকে কথাকারের সর্বোচ্চ মহিমায় রেখে রবীন্দ্রনাথ এগিয়ে এসেছিলেন নতুন অভিজ্ঞতা অন্বেষণে। সেই অন্বেষণের শেষ ধাপে কল্লোলের লেখকেরা নতুন বেগের সঞ্চার ঘটালেন কথাসাহিত্য ধারায়। বাংলা কথাসাহিত্য যুগ ও কালের প্রেক্ষাপটে লক্ষ্যণীয়ভাবে পরিবর্তিত করল তার প্রবাহ। নবরূপে উন্মোচিত হতে থাকলো কথাসাহিত্যের রূপ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা।

কথাসাহিত্যের বিভিন্ন শাখার প্রত্যেকটিতে রয়েছে মৌল শিল্পধর্ম। সাধারণত দুইরূপে এই মৌল

শিল্পধর্ম উদ্ভাসিত। প্রথমত তার শিল্পগত সাধারণ পরিচয়, দ্বিতীয়ত তার শিল্পগত বিশিষ্ট পরিচয়। এই বিশিষ্ট পরিচয় হল – মধ্যবিত্তের ছবি, মধ্যবিত্তের আত্মানুসন্ধানের রূপ। কেননা শিল্পমাত্রেই মানবপ্রকাশ, মানুষের আত্মপরিচয়। বাংলা কথাসাহিত্য তত্ত্বগতভাবে এই দুই পরিচয়ের মধ্য দিয়েই উদ্ভাসিত। কিন্তু শিল্পের এই মাধ্যম – মানবপ্রকাশ – মানব আত্মপরিচয়ের বৈশিষ্ট্যে-ইতিহাসকে সঙ্গী ক'রে শুরু করেছে পথচলা। বঙ্কিমচন্দ্র ঐতিহাসিক উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী'র লিপিকার হয়ে সেই যাত্রাপথের প্রথম পথিক হন।

বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলো সমসাময়িক অন্যান্য ঐতিহাসিক উপন্যাসের তুলনায় অনেক উঁচু স্তরের বলে আজ প্রমাণিত, ও সর্বজনস্বীকৃত। বঙ্কিমের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলো অপেক্ষাকৃত জটিল ও মিশ্র ধরনের। তাঁর আদর্শবাদ, জাতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁর প্রবল আশা-আকাঙ্খা, তাঁর দেশমাতৃকাগত প্রাণ, ঐতিহাসিক উপাদানসমূহকে অনুরঞ্জিত করে তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাসের উপর স্থাপিত করেছে কখনো মহাকাব্যের বিশালতা, কখনো গীতিকাব্যের উন্মাদনা।

'আনন্দমঠ'—এ সন্নাসী বিদ্রোহের মধ্যে তিনি তাঁর স্বদেশ-প্রেম ও অগ্নিপ্রত্যয় সঞ্চারিত করে তাকে আকৃতি দিয়েছেন এক গৌরবমন্ডিত মহিমান্বিত আদর্শের, আরোপ করেছেন এক রাষ্ট্রনৈতিক ও ধর্মনৈতিক বিপ্লবের গৌরব। 'দুর্গেশনন্দিনী', 'চন্দ্রশেখর' ও 'রাজসিংহ' এই উপন্যাসত্রয়ীতে বঙ্কিমের ঐতিহাসিক সত্যনিষ্ঠা ও দায়িত্বজ্ঞানের চিহ্ন সুস্পষ্ট। 'সীতারাম' বা 'দেবী চৌধুরানী' কিংবা 'কপালকুন্ডলা'য় কোন গুরুতর ঐতিহাসিক ঘটনার সংযোগ না থাকলেও, ইতিহাস এবং ধর্মের ক্ষেত্র থেকে নি:সৃত এক কাল্পনিক আদর্শের জ্যোতি বিচ্ছুরিত হয়েছে এদের সামাজিক জীবনের উপর। বঙ্কিমচন্দ্র এক প্রমাণনিরপেক্ষ সহজ সংস্কারের মধ্যে দিয়ে ইতিহাসের শিকড়ে হাত দিয়ে জটিল ঘটনাবিন্যাসে টেনে বের করেছেন যুগবিশেষের বা ব্যক্তিবিশেষের স্বরূপ।

বৈষ্ণব কবিতার বাইরে, ধর্মের ছদ্মবেশ ত্যাগ করে কিছুকাল আগে থেকেই স্বীকৃতি পাচ্ছিল প্রেম। এই প্রেমের অধিকাংশটাই 'বিদ্যাসুন্দর' গোত্রের আদিরস। ব্যক্তি গৌণ হয়ে আকর্ষণ মুখ্যরূপ ধারণ করেছিল। সে সব আদিরসাত্মক কাহিনীতে ছিল ব্যক্তিত্ববর্জিত পাত্র-পাত্রী – যা মূলত শৃঙ্গার কাহিনী।

আধুনিক যুগের প্রবর্ধমান বাস্তব প্রবণতায় জন্ম নিয়েছে সামাজিক উপন্যাস – যা নিজের প্রভাবজালে জড়িয়ে ফেলতে দ্বিধা করেনি রোমান্সকে। ফলে আধুনিক রোমান্স বাস্তবতার মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে নির্দ্বিধায় গ্রহণ করেছে সত্যের কঠোর সংযম। রোমান্সের পৃথিবীতে আর যেন 'ঠাঁই নেই' অতিপ্রাকৃত বা অবিশ্বাসের। তাই রোমান্স লেখককে পটভূমি বা প্রবণতা, বাস্তব বা ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর নির্ভর করে সৃষ্টি করতে হয় প্রতিটি সূত্র, প্রতিটি কারণ, যাতে মাটির সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত না হয় সেদিকে রাখতে হয় সজাগ দৃষ্টি।

> ঔপন্যাসিকের মন আগের যুগের অন্ধ বিশ্বাসীর মন নয়। এ মন শুধু সন্দেহী তা নয় অনেক সময় রীতিমত ব্যঙ্গপ্রবণ এবং সে ব্যঙ্গ শুধু দেবদ্বিজের প্রতি প্রযুক্ত নয়, নিজের প্রতিও প্রযুক্ত। এই মনই সমাচার দর্পণে 'বাবু' নামের নকশা রচনা করে, 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' লেখে। আবার এই মনই রাধাকে নিয়ে নয়, সাহস করে মানবী নিয়েই প্রণয় কাহিনী রচনা করে, সমাজে আত্মসচেতন এবং আত্ম-অধিকার সচেতন নায়িকার সন্ধান করে। কাছের সমাজে না পেলে দূর ইতিহাসে পিছিয়ে গিয়ে ভূদের মুখোপাধ্যায়ের মত ঐতিহাসিক উপন্যাস (সফল স্বপ্ন, অঙ্গুরী বিনিময়-১৮৫৭) রচনা করে। এই মনই 'দুর্গেশনন্দিনী'র (১৮১৫) বিমলার দু:সাহসকে, বিমলার ত্রিমাত্রিক ব্যক্তিত্বকে উপভোগ করে, নবাব নন্দিনী আয়েসাকে দিয়ে বলায় 'এই বন্দী

আমার প্রাণেশ্বর'। এই মনই 'চন্দ্রশেখরে' (১৮৭৫) প্রায়শ্চিত্তা-পরিশুদ্ধা শৈবালিনীকে দিয়ে প্রতাপকে বলায় 'আমি সুখী হইব না। তুমি থাকিতে আমার সুখ নাই।' –প্রতাপের বিস্মিত বিমূঢ় উক্তিতে আবার বলায় 'যতদিন তুমি এ পৃথিবীতে থাকিবে, আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও না। স্ত্রীলোকের চিত্ত অতি অসার কতদিন বশে থাকিবে জানি না'। প্রেম ও প্রকৃতির এই বলিষ্ঠ স্বীকৃতি, নারীর মুখে এই অকুন্ঠ ঘোষণা, নারী ব্যক্তিত্বের এই সুস্পষ্ট আত্মপ্রকাশ মধ্যযুগের কোন কাহিনীকারের কল্পনায় এ রকম সাড়া কখনই জাগাত না যেমন জাগিয়েছে বঙ্কিমচন্দ্রের ক্ষেত্রে।[১]

আধুনিক মননে উদ্দীপ্ত বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সৃষ্টির মধ্যে দেখিয়েছেন ভবিষ্যতের ইশারা, সত্যের ভবিষ্য অঙ্কুর – বাস্তব থেকে যা চ্যুত নয়। সেই সময়কার সমাজে যা দুর্লভ, যা লুকিয়ে আছে ভাবীকালের গোপন ছায়ায়, যাঁর দৃষ্টি উন্মোচন করে সেই আগতসত্যকে তিনিই প্রকৃত দ্রষ্টা। বঙ্কিমচন্দ্রের আধুনিক মনন ও মেধা ঐ দ্রষ্টারূপেই প্রতীয়মান।

হয়ত বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে যা ছিল আধুনিক, বর্তমানে অনেকের কাছেই তা অনাধুনিক। কিন্তু অন্তর্গূঢ় সৃষ্টিকার – যে পালাবদলের ইঙ্গিত, সমস্যা ও সঙ্কট, যা আবহমান কাল অতিক্রম করে ভবিষ্যতের প্রেক্ষাপটে সত্যময় হয়ে দেখা দেবে, – তাকে যখন বহুপূর্বে রচনা করে যান, তাকে আধুনিক না বলাটাই এক ধরনের অনাধুনিকতা। এই বিশ্লেষণের প্রমাণ দেবে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ'।

বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে রোমান্সের মিশ্রণ যে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত, সে কথা অস্বীকার করা যাবে না। বঙ্কিমচন্দ্রের মতো শক্তিশালী ঔপন্যাসিক যাঁকে শ্রী অরবিন্দ বলেছেন— 'He created a Language, a Literature and a Nation', তাঁর রচনায় এই রোমান্সের মিশ্রণ দেখতে পাওয়া যায় যত্রতত্র। আধুনিকরাও যে এই মিশ্রণ থেকে মুক্ত নয়, তা প্রমাণ করার অপেক্ষা রাখে না। কেন না —

> বঙ্কিমচন্দ্রের কালের তুলনায় আধুনিক কালের বাঙালী জীবন অনেক বেশী প্রতিহত এবং বিক্ষুব্ধ। অতৃপ্ত তৃষ্ণার প্রেতভূমি, এ কালের বাঙালী মনের স্তরে স্তরে বিন্যস্ত। ছদ্মবেশী রোমান্সের এইটিই বরং মরশুম।[২]

বঙ্কিমের রোমান্সের পটভূমি বা প্রবণতার জন্য বিভিন্ন কারণ উল্লেখ করা যায়। প্রথমত, তখনও বাংলা উপন্যাস বা কথাসাহিত্যের ঐতিহ্য নির্মাণ হয়নি। দ্বিতীয়ত, বঙ্কিমের ইংরেজী রোমান্স পাঠের অভ্যাস এবং স্কটের উপন্যাসের প্রতি তাঁর প্রীতি। তৃতীয়ত, তার ইতিহাস অনুরুক্তি এবং চিত্রধর্মী ইতিহাস কল্পনা। তবে এতসব কারণ সত্বেও তাঁর মধ্যে উগ্র অতৃপ্ত ইচ্ছার অত্যাচার নেই।

এতদিনে একটা সত্য প্রকট যে রোমান্সের লক্ষ্য বাস্তব জীবনের ব্যাখ্যা নয়। রোমান্সের ভূমিকা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। অতি শিথিল তার কার্যকারণের শৃঙ্খলটুকু। রোমান্সের রাজত্বে অ্যারিষ্টটল কথিত সম্ভাবনা একেবারেই অচল। মানুষের জীবনের চলমান রূপ নিয়ে উপন্যাসে যে স্তরের লজিক উদ্ভাসিত হয়, রোমান্সের ম্যাজিক তার থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। রোমান্স স্থির ছবি নিয়ে দৃশ্যমান। সেখানে চলমান জীবনের প্রবহমানতা, কার্যকারণনির্ভর কোনও ক্ষুদ্র বা মহৎ পালাবদল, চরিত্রের ক্রমবিকাশের জ্যোতি অনুপস্থিত। স্থিরতার কারণে সেখানে চরিত্ররা ব্যক্তিবিশেষরূপে অগণ্য। বাস্তবের সমাজ প্রবহমানতার মধ্যে তারা 'তৈরী ছক' হয়েই উপস্থিত। সুনির্দিষ্ট আকারময় দেশকালহীন এইসব রোমান্সের চরিত্ররা। কেননা সৃষ্টিমুহূর্ত থেকেই 'তৈরী স্থিরপট' রূপে নিজেদের উপস্থাপিত করেছে। তারা আবহমান কালের হয়েই নিজেদের রূপ প্রতিষ্ঠা করে থাকে। বিশেষ দেশ-কাল দিয়ে তাদের চিহ্নিত করা যায় না। আবহমান সত্যের স্রোতে রোমান্সের যাত্রা।

জীবনজিজ্ঞাসু রূপদ্রষ্টা শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র জীবনের গূঢ় গহনে ডুব দিয়ে ডুবুরির নিষ্ঠায় তুলে আনলেন পরমা সত্য। সেই সত্যর অদ্রব প্রতিমা, জীবন্ত প্রতিমূর্তি প্রকাশিত হল 'কপালকুন্ডলা', 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'রাজসিংহ', 'চন্দ্রশেখরে'। তাঁর জীবনবোধের গভীরতা এবং জীবন থেকেই উৎসারিত দেশকালব্যাপী নানা স্তরের উপলব্ধিময় অভিজ্ঞতাকে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সৃষ্টির কল্পনায় জীবনের তাপে তাপিত করে সৃষ্টি করেছেন পরপর রূপময় জীবন্ত উপন্যাস।

> বঙ্কিমচন্দ্রের অভিজ্ঞতার সত্য, সেদিনের বাঙালীর জীবনবোধের সত্য। এই সত্যকে প্রকাশ করার জন্য যে কাহিনীতে ঠিক সেইদিনের জীবনকে অবলম্বন করতে হবে তার কোন হেতু নেই। এই সত্যকে যদি লেখক প্রকাশ করতে পেরে থাকেন, তাহলে তা তিনি রোমান্সের নতুন পোষাক পরেই করুন, আর ইতিহাসের পাত্রপাত্রী, স্থানকাল অবলম্বন করেই করুন, আসলে তিনি উপন্যাসই লিখেছেন। কাহিনীর বাইরের রূপটা বড় কথা নয়। প্রশ্ন করে লাভ নেই লেবেলটা রোমান্সের না উপন্যাসের। প্রশ্ন করতে হবে, জীবন-জিজ্ঞাসা অভিব্যক্ত হয়েছে কি না, জীবনবোধ ভাষা পেয়েছে কি না, জীবন-সত্য রূপ পেয়েছে কি না।[৩]

সাহিত্যের আধুনিকতা এবং সমাজ-বাস্তবের আধুনিকতার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতম হলেও রূপ এবং কার্যকারণ সম্পর্ক সম্পূর্ণভাবেই পৃথক সত্ত্বা বলে বিবেচিত। প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আধুনিকতাকে প্রকাশ করে থাকে। কিন্তু সাহিত্যে আধুনিকতার রূপ প্রস্ফুটিত হলে অনিবার্যভাবেই তাতে প্রতিফলিত হয় সমাজের আধুনিকতা। অন্যদিকে আধুনিক সমাজ নিজেকে প্রকাশ ক'রে থাকে আধুনিক সাহিত্যেই। ঊনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে যে আধুনিকতা দৃশ্যমান তার সম্পূর্ণ ভাগটাই পাশ্চাত্যের অনুকরণ নয়। সম্পূর্ণ অনুকরণ হলে বাংলা সাহিত্যে ঊনিশ শতকে মধুসূদনের আবির্ভাব ঘটতো না। আমরা বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে পেতাম না। কিংবা বিশ শতকে শরৎচন্দ্র বা প্রমথ চৌধুরীকে পাওয়া সম্ভব ছিল না।

সাহিত্যে আধুনিকতার লক্ষণ দুদিক থেকে প্রকাশিত হতে পারে। প্রথমত রূপ ও প্রকরণের নতুনত্বের জন্য এবং দ্বিতীয়ত, বিষয়, চরিত্রচিত্রণ ও বয়ন পদ্ধতির অভিনবত্বের জন্য। রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষণিকা' বা 'বলাকা' তার প্রমাণ। উপন্যাস এবং ছোটগল্পের ক্ষেত্রেও সমবিচার প্রত্যাশিত। সেখানেও রূপ ও প্রকরণ, বিষয়-চরিত্রচিত্রণ ও বয়ন পদ্ধতি পুরোনোকে খন্ডন করে অভিনবত্ব নিয়ে ধারাবাহিকভাবে উদিত হয়। এই আধুনিকতার মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হয় সাহিত্যে চিত্রিত সমাজ সত্য এবং লেখকের জীবনবোধ। তাই সাহিত্যে আধুনিকতা - অনাধুনিকতা বিচারের ক্ষেত্রে লেখকের সমাজ এবং জীবনবোধ অত্যন্ত মূল্যবান। একজন প্রকৃত সাহিত্যলেখক যে মানবজীবনের রূপদ্রষ্টা তা প্রকাশ পায় তাঁর জীবন দর্শনে, সাহিত্যবুননে। জীবনদর্শনের রূপমোহ থেকে সাহিত্যলেখক কখনো চ্যুত হতে পারেন না। একে দার্শনিকতা আখ্যা দিলেও আপত্তি ওঠার কথা নয়। কারণ সাহিত্যের সবকটি শাখাতেই দর্শনের গতি অবাধ। শিল্পী বা সাহিত্যিক নিজে না দেখলে অন্যকে দেখাবেন কি করে ? তাই এ কথা একবাক্যে স্বীকার করে নেওয়া ভাল যে মহৎ সাহিত্য বা মহৎ সৃষ্টি একান্তভাবেই দার্শনিকতানির্ভর। এক দার্শনিক দৃষ্টির গভীরতায়, বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র বিরল, ব্যতিক্রমী রূপস্রষ্টা, দার্শনিক এবং অবশ্যই আধুনিক।

বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের ঐতিহ্যবাহিত প্রধান ধর্ম-বিশ্বাসগুলোকে একদিকে যেমন বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন, অন্যদিকে ঠিক তেমনই চুলচেরা বিচারের সামনে দাঁড় করিয়েছেন আধুনিকতার প্রত্যেকটি প্রত্যয়কে। প্রতিটি বিচার-বিশ্লেষণের নির্যাসকে পুনর্গঠন করে গ্রহণ করেছেন নিজের মতো করে। এই বিচার-বিশ্লেষণ এবং গ্রহণ-বর্জন সম্ভব হয়েছে তাঁর প্রখর নৈয়ায়িক বুদ্ধির কারণে। আর এই কারণেই

বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সাহিত্যে আধুনিক যুগের প্রতিনিধি।

রবীন্দ্রনাথের মতে বঙ্কিমচন্দ্রের বুদ্ধি কিন্তু ঐতিহ্যের এলাকায় আগাগোড়া স্বাধীন থাকেনি। ভারতীয় সংস্কৃতির বিচার-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের বুদ্ধির সমস্ত ক্রিয়াই তাঁর হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা দ্বারা প্রাচ্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের প্রয়াসে পরিচালিত। গ্রহণ-বর্জনের মধ্য দিয়েই ভারতীয় সংস্কৃতির অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঐতিহ্যকে তিনি নিজস্ব মনোকল্পিত ব্যাখ্যার সাহায্য নিয়ে নিজস্ব চিন্তায় জারিত করে পুনর্গঠনসহ রূপ দিয়েছেন। তা সম্ভব হয়েছে তাঁর স্বাধীন বুদ্ধির প্রখরতায়। এই স্বাধীন বুদ্ধির প্রয়োগ বিশেষত্ব নিয়ে এসেছে ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে।

তবুও পাশ্চাত্য সাহিত্যের কাছে বঙ্কিমচন্দ্রের ঋণের বিষয়টা অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। বঙ্কিম নিজেই স্বীকার করেছেন উইলকি কলিন্‌স এবং বুলেয়ার লিটনের কাছে তাঁর ঋণের কথা। আর স্কটের কথা'তো সর্বজনবিদিত। এইসব পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাব কিংবা ঋণ শুধুমাত্র পদ্ধতি-প্রকরণ বা দু'একটি চরিত্র সৃষ্টির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। কারণ প্রভাব বিষয়টা ছিন্নছিন্ন রূপে যোগাযোগ ঘটায় না, শিরা-উপশিরা সর্বত্র প্রবাহিত হয়ে এক অন্তঃসলিলা ফল্গুর ভূমিকা নেয়।

ঊনিশ শতকের শেষ দশকে (১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে) বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর মাত্র কয়েক বৎসর পরেই সূচনা হয় বিশ শতকের। বঙ্কিমযুগের অবসান-পর্দা বাংলা কথাসাহিত্য মঞ্চে নেমে আসতেই রবীন্দ্রনাথ উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠেন। রবীন্দ্রনাথ আগেই শুরু করেছিলেন বঙ্কিমের অনুসরণে। স্বাতন্ত্র পেলেন পরে।

ঐতিহ্য সম্পর্কে বিতর্ক চলেছে এবং চলছে অর্ধশতাব্দী ধরে যার কোনো নির্দিষ্ট কাঠামো, সংজ্ঞা নিরূপণ আজ অবধি সম্ভব হয় নি। অতীত বর্তমানের দ্বন্দ্ব, ঐতিহ্য এবং ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্ব, সমষ্টি চৈতন্য-মগ্ন চৈতন্যের গভীরে নিহিত স্মৃতির দ্বন্দ্ব, ঐতিহ্য ও ব্যক্তি-মনীষার দ্বন্দ্ব ইত্যাদি বিতর্কে জড়ানো ঐতিহ্যকে শরীরে ধারণ করে আধুনিকতা প্রবহমান।

গত দেড়'শ বছর ধরে আমাদের সাহিত্য প্রবলভাবে পশ্চিমী চিন্তার আদলে আদৃত। ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে নিজেদের সাহিত্য সংযুক্তির প্রয়োজনীয়তা আছে কি নেই – এ ধরনের কূট প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। ঐতিহ্য কি বহু যুগের অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি, সংবেদনশীলতা ও স্মৃতির এক সংহত–আকারবদ্ধ স্থিরতা নিয়ে উদ্ভাসিত এমন জিজ্ঞাসা উঁকি দেয়। অথবা আর একটি জিজ্ঞাসাও প্রশ্ন করে, ঐতিহ্য কি প্রবহমান চৈতন্য? তার কোনো স্থির রূপ দৃশ্যমান হবে না শুধুই চলমান থাকবে? না কি অনড়তার সত্তা নিয়ে কখনো পাওয়া যাবে তার পূর্ণাবয়ব।

আজ কেউ হয়ত প্রশ্নাতীতভাবে গ্রহণ করবেন ঐতিহ্যকে, আবার কেউ তাকে দূষিত, জীর্ণ বা মৃত জ্ঞান করে সরাসরি বর্জন করবেন। কিন্তু যদি সমস্তটাকেই বর্জন করে দেওয়া হয়, তাহলে অনিবার্য পরিণতি নিয়ে আসবে আত্মপরিচয়ের সংকট। আবার আত্মবিস্তারের সংকট নির্দিষ্টভাবেই ঘনিয়ে আসবে সম্পূর্ণটা গ্রহণ করলে। ঐতিহ্যকে গ্রহণ বর্জনের এই তর্ক মানুষের ইতিহাসকে আলোড়িত করেছে। এই দ্বন্দ্বকে দেখা যায় অতীত-বর্তমানের দ্বন্দ্ব হিসাবেও।

ঐ ঐহিহ্যের ইতিহাসে যে জগৎ বা পটভূমি ও প্রবণতা নিহিত ছিল চেতনায়, বৈষ্ণব কবিতা – মঙ্গলকাব্য – সংস্কৃত মহাকাব্যের লোকায়ন – ফারসী কাহিনী – সহজিয়া – সুফি চিন্তা নিয়ে, তার সঙ্গে সংযুক্ত করা হ'ল ইংরেজী সাহিত্য বা ইউরোপীয় সাহিত্য। কিন্তু পশ্চিমী সাহিত্যের সঙ্গে সেই সংযুক্তি যে খুব সহজ ও স্বাভাবিকভাবে হয়নি, কালের যাত্রায় তা প্রমাণিত।

উপনিবেশের প্রয়োজনে শুরু হয়েছিল ইংরেজী শিক্ষা। আমাদের নিজস্ব ঐতিহ্যের উপাদানকে খন্ডিত করে পশ্চিমকে গ্রহণ করা হয়েছিল মূলত ঐতিহ্য বিস্তারের মহৎ সত্যকে স্পর্শ করার প্রয়োজনে।

কিন্তু ঐতিহ্যের মূল লোকজীবনের স্রোত থেকে ছিন্ন হয়ে এক 'নতুন'—এর জয়ধ্বজা উত্থিত হয়েছিল শেষপর্যন্ত। ঐ নতুনের সঙ্গে জড়িত ছিল পাশ্চাত্য মনোভূমি। তার ফলে জন্ম নিল এক 'নতুন' শক্তিমান সাহিত্য – যাকে বলা হলো 'আধুনিক'। প্রতীচ্যের সঙ্গে নৈকট্যের প্রকৃতি অনুযায়ী নিরূপিত হল বাংলা সাহিত্যের 'আধুনিকত্ব'।

ঔপনিবেশিক শিক্ষায় ইংরেজী ভাষা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠলো। একই ভাবে ইংরেজী সাহিত্য আমাদের চিন্তা ও মননের সামনে কতগুলো 'মডেল' দাঁড় করিয়ে দিলো, যে মডেল অগ্রাহ্য করা কোন উপনিবেশের পক্ষে একান্তই অসম্ভব।

এই কারণে, খুব স্বাভাবিক ভাবেই বিশ্ব-সাহিত্য সম্পর্কে খোঁজ-খবরের জন্য, তা গ্রীক, ল্যাটিন বা আধুনিক ইউরোপের সাহিত্যই হোক, আমাদের নির্ভর করতে হয়েছে ইংরাজী ভাষার ওপর। ঐতিহ্যের বিস্তারের পথে অভিযাত্রী হয়ে বাংলা সাহিত্যে এসে প্রবেশ করলো প্রতীচ্যনির্ভর আধুনিকতা। বাংলা সাহিত্যের এই পর্বে প্রকৃত আধুনিকতা নিয়ে আবির্ভূত হলেন, রবীন্দ্রনাথ।

যাঁরা আধুনিক মনের লক্ষণ ও গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ, তাঁরা মোটামুটিভাবে একটি মতৈক্যে পৌঁছেছেন যে — আধুনিক মনের প্রধান বৈশিষ্ট্য – আত্মসচেনতা। যদিও রবীন্দ্রনাথের আধুনিকতা বাদ-প্রতিবাদ এবং গ্রহণ-বর্জনে উদ্বেলিত তবুও সেই কূট তর্কের ফাঁদে পা না দিয়ে আমরা অনায়াসে বলতে পারি, বাংলা কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথই আধুনিকতার জনক।

> আধুনিক জীবনবোধের কারণে, সম্পূর্ণ সেকুলার দৃষ্টির কারণে, নাগরিক বৈদগ্ধ্য ও স্বাতন্ত্র্যবোধের কারণে, দেশও কালের সম্পর্কে –আধুনিক জীবনপ্রবাহের সম্পর্কে জাগ্রত চেতনার কারণে, প্রখর বাস্তববোধের কারণে, রবীন্দ্রনাথকে আমরা অনায়াসে ভারতবর্ষের তাঁর কালের আধুনিকতার একজন অগ্রগণ্য এবং শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি বলে গণ্য করতে পারি।[৪]

আধুনিকতার প্রখর লক্ষণ –'আত্মসচেতনতা' যা রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট চরিত্রগুলো স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে। স্রষ্টা হিসাবে তিনি এবং তাঁর সৃষ্টি উভয়েই আত্মসচেতনতাবোধে উজ্জীবিত।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ রায়, গোপিকা নাথ রায়চৌধুরী প্রমুখের বিশ্লেষণ অনুসরণ করলে বলা যায় যে 'চোখের বালি' বাংলা কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে আধুনিকতার প্রথম স্পষ্ট নিদর্শন। শুধু তাই নয়, উপন্যাস তত্ত্বকে সামনে রেখেও প্রমাণ করা যায় 'চোখের বালি' বাংলা সাহিত্যে প্রথম খাঁটি উপন্যাস। 'চোখের বালি' থেকেই বাংলা উপন্যাসের পুরনো রীতি বর্জন করে, উনিশ শতকের প্রাচীন ধারার ঘটনাবহুল উপন্যাসের পরিবর্তে রবীন্দ্রনাথ নির্মাণ করলেন, নবপর্যায়ের সৃষ্টি।

> যে মোহাচ্ছন্নতা নিয়ে পূর্বাপর বাংলা উপন্যাসের প্রধান দুর্বলতা, সেই দুর্গ্রহ থেকে তাঁর উপন্যাস একেবারেই মুক্ত। অবশেষে, ব্যক্তিত্বের সমস্যাই যেহেতু তাঁর উপন্যাসের প্রধান সমস্যা, সেইজন্যে ক্রমে-ক্রমে গল্প বলার দায়ও তিনি দিয়ে দিলেন চরিত্রের হাতে।[৫]

'চোখের বালি'র সূচনায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

> আমার সাহিত্যের পথযাত্রা পূর্বাপর অনুসরণ করলে ধরা পড়বে যে 'চোখের বালি' উপন্যাসটা আকস্মিক, কেবল আমার মধ্যে নয়, সেদিনকার বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে। ....শয়তানের হাতে বিষবৃক্ষের চাষ তখনও হত, এখনও হয়, তবে কিনা তার ক্ষেত্র আলাদা, অন্তত গল্পের এলাকার মধ্যে।

> এখনকার ছবি খুব স্পষ্ট, সাজসজ্জায় অলংকারে তাকে আচ্ছন্ন করলে তাকে ঝাপসা করে দেওয়া হয়, তার আধুনিক স্বভাব হয় নষ্ট। তাই গল্পের আবদার যখন এড়াতে পারলুম না তখন নামতে হল মনের সংসারের সেই কারখানাঘরে যেখানে আগুনের জ্বলুনি হাতুড়ির পিটুনি থেকে দৃঢ় ধাতুর মূর্তি জেগে উঠতে থাকে।.....মানববিধাতার এই নির্মম সৃষ্টিপ্রকৃয়ার বিবরণ তার পূর্বে গল্প অবলম্বন করে বাংলা ভাষায় আর প্রকাশ পায়নি। ....সাহিত্যের নবপর্যায়ের পদ্ধতি হচ্ছে ঘটনাপরম্পরার বিবরণ দেওয়া নয়, বিশ্লেষণ করে তাদের আঁতের কথা বের করে দেখানো।[৬]

সাহিত্যের 'নবপর্যায়ের পদ্ধতি' অনুসরণ করে 'আঁতের কথা' বলতে গিয়ে রবীন্দ্র নাথ বিংশ শতাব্দীর দিকে উন্মুক্ত দৃষ্টি রেখে এগিয়েছিলেন ঠিকই কিন্তু তাঁর সেই আধুনিক ভাবনার ভিত্তি নির্মাণ করেছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর অভিজ্ঞতা। বিষয়টি স্পষ্ট হয় অধ্যাপক অশ্রুকুমার শিকদারের লেখায় —

> ভাব, যা প্রধান লক্ষ্য, তাকে উপস্থিত করার অপরিহার্য বাহনের চেয়ে বেশি দাম তিনি প্লটকে দিতে চাইলেন না। ঘটনা নির্মাণের দায় চলে গিয়ে উপন্যাস যেমন হয়ে উঠলো ভাবকেন্দ্রিক, তেমনি ঘটনার পিছনে চরিত্রের যে ইচ্ছা, অভিপ্রায়, উদ্দেশ্য কাজ করেছে তার নিপুণ তন্নতন্ন বিশ্লেষণে তিনি দেখালেন অসামান্য পারদর্শিতা। অথচ এ কথাও তিনি ভুললেন না যে ব্যক্তির উন্মেষ সম্পূর্ণ হয় অথবা খন্ডিত হয় সামাজিক পরিস্থিতির ফলে। অর্থাৎ ঊনিশশতকী শিক্ষাকে ভুললেন না, বিশশতকী দৃষ্টি নিক্ষেপের মুহূর্তেও।[৭]

'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব'। মানুষের প্রতি রবীন্দ্রনাথ কখনো বিশ্বাস হারান নি। কিন্তু এই বিশ্বাস রক্ষার পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথ এক সংস্কারমুক্ত আধুনিক জীবনপথেও সচ্ছন্দ পদচারণা করেছেন। গোপিকানাথ রায়চৌধুরী লিখেছেন —

> আমৃত্যু এই সুদৃঢ় মানব প্রত্যয় ও শাশ্বত জীবনসত্যে আস্থা রবীন্দ্রনাথের জীবন দর্শনের মূল ভিত্তি। কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে তাঁর চিন্তাধারা ও মূল্যবোধ অনড়, অচল। বরং এর বিপরীতটাই সত্য। জীবনের অন্তর্নিহিত বৈচিত্র্যধর্মে জীবনশিল্পী রবীন্দ্রনাথের ছিল অগাধ বিশ্বাস। তাই দেশ ও কালের পটে মানবধর্ম যে বিচিত্র জটিল রূপ নেয়, নানা প্রতিকূল ঘটনা ও পরিস্থিতি, চলমান জীবনের নানা তত্ত্ব বিশ্বাসের সঙ্গে সংঘাত-সংঘর্ষের ফলে সৃষ্ট জীবনাবর্তের যে বাস্তব প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠে, তাকে সাহিত্যে বাণীবদ্ধ করেছেন রবীন্দ্রনাথ গভীর আগ্রহে। সমস্ত সংস্কার, অভ্যাস ও প্রথাবদ্ধ ভাবনার দাসত্ব-শৃঙ্খল চূর্ণ করে তিনি অগ্রসর হয়েছেন জীবনের সংস্কারমুক্ত সচল প্রাণোজ্জ্বল পথে। এক বিস্ময়কর প্রবল প্রাণধর্মের প্রেরণায় রবীন্দ্রনাথ এমন করেই জীবনের পর্বে পর্বে 'নূতন যৌবনের দূত'-রূপে আবির্ভূত হয়ে বৈচিত্র্যের স্বাদ সঞ্চার করেছেন তাঁর সাহিত্যে। শাশ্বত জীবনসত্য ও চিরন্তণ মানবধর্মে আস্থাশীল হয়েও এই অর্থে রবীন্দ্রনাথ 'প্রগতিশীল' ও 'আধুনিক'।[৮]

বঙ্কিমচন্দ্রের কথা সাহিত্যে রোমান্সসুলভ বিষয়গুলো রবীন্দ্রনাথে এসে অন্তর্হিত হয়। বাহ্যিক আড়ম্বরপূর্ণ বৈচিত্র্য ও চমকপ্রদ সংঘটনকে এড়িয়ে যেটুকু রোমান্স রবীন্দ্র কথাসাহিত্যে উঁকি দেয় তা শুধু গহন গভীর নয় অতি সূক্ষ্ম এবং অতলস্পর্শ রহস্যের গভীর সুর নিয়ে তার আত্মপ্রকাশ।

এক চিরকালীন বাস্তবতার প্রবর্তন করে রবীন্দ্রনাথ যে আধুনিকতার সূচনা করলেন, তাই আধুনিক সাহিত্যের প্রধান লক্ষণ। 'চোখের বালি' কে নিশ্চিন্তভাবে এমনই এক দৃষ্টান্ত বলা যায়। আধুনিক উপন্যাসে বাস্তবতা যে বিশেষ দ্যোতনা নিয়ে ব্যবহৃত এবং উন্মোচিত হয়, বাংলা কথাসাহিত্যে তার সূত্রপাতও এখানেই। তথ্যানুসন্ধান ও মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ এই উপন্যাসে প্রধান উপজীব্য, নৈতিক বিচার অবশ্যই গৌণ। অন্তর্নিহিত শোভনতা, আত্মোপলব্ধি এবং সনাতন সৌন্দর্যবোধের মধ্য দিয়ে 'চোখের বালি' এগিয়ে গেছে ক্রম পরিণতির দিকে। নূতন-পুরাতনের সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে এর প্রকাশ যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে তাও আধুনিকতার অন্যতম লক্ষণ ব'লে বিবেচিত। ঘটনা পরম্পরার বিবরণ দেওয়া আধুনিকতার লক্ষণ নয়। মনের গহন গভীরের চেতনা প্রবাহকে বিশ্লেষণ করে তাদের 'আঁতের কথা' টেনে বের করে দেখানোই আধুনিকতার প্রধান লক্ষণ—

> বিংশ শতাব্দীর আধুনিকতার অন্যতম এক লক্ষণ হলো ডেপথ্ সাইকলজির (Depth Phychology) তত্ত্বে আস্থা, মানুষকে – মানুষের মনকে তার চেতন ও অবচেতন বাসনা-কামনার, 'উচ্চতর বৃত্তি' এবং 'নিম্নতর প্রবৃত্তির' রঙ্গভূমি রূপে দেখা, মানুষের চিন্তা অনুভব ও কর্মকান্ডের ব্যাখ্যায় ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞানের তত্ত্ব প্রয়োগ করার চেষ্টা।[৯]

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও চরিত্র সৃষ্টিতে 'চোখের বালি'তে আধুনিকতার এই লক্ষণগুলো বিদ্যমান।

'গোরা' উপন্যাসে পাওয়া যায় অনেকটা মহাকাব্যের বিশালতা এবং বিস্তৃতি। 'চতুরঙ্গে' জোর পড়েছে অন্তর্জীবনের ওপর। ব্যবহার ঘটেছে প্রতীকের। অবচেতন মন সম্পর্কে দেখা দিয়েছে সচেতনতা। বিংশ শতাব্দীর আধুনিকতা কথাসাহিত্যের ধ্রুপদী ধারাকে বাতিল না করে, এড়িয়ে গিয়ে স্থাপিত করলো অন্য এক ধারার। এই ধারার মূল সুর অন্তর্জীবনের রূপায়ণ। এই বিশেষ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ সার্থক ও সফল।

মনস্তত্ত্বমূলক বলতে রবীন্দ্রনাথ কোনদিনই অসুস্থ মানসিকতাসম্পন্ন মানুষের বিকৃত মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণমূলক আখ্যান বুঝতেন না। তাঁর সৃষ্ট চরিত্ররা কেউ অসুস্থ বিকৃতমনা নয়। ১৩৩৮ সালের ২৪শে আশ্বিন ডা: সরসীলাল সরকারকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিতে এই বক্তব্যের সমর্থনে মন্তব্য পাওয়া যায়— 'এই বিজ্ঞানের (মনোবিজ্ঞান) সূচনাটি এখনো অপরিণত আকারে আছে, তাই আপন ইচ্ছামত যা তা বলবার মতো এমন উপলক্ষ্য আর নেই। বিশেষত নিজের মনের গ্লানিকে বিজ্ঞানের ছাপ মেরে কুৎসা আকারে চালান করবার এমন সুযোগ আর পাওয়া যাবে না।' —ব্যক্তিসত্তার গহন জটিল সমস্যা সমগ্র ব্যক্তিত্বের স্বরূপ রহস্যের অন্বেষণ-উন্মোচন ব্যক্ত করার তপস্যায় তিনি তপস্বী।

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের প্রথম পর্বের সৃষ্টি – করুণা, বউঠাকুরাণীর হাট, রাজর্ষি। 'করুণা'র প্রায় চার বছর পর 'ভারতী'তে প্রকাশিত হতে থাকে 'বউঠাকুরাণীর হাট'। গ্রন্থাকারে 'বউঠাকুরাণীর হাট' ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারীতে প্রকাশিত হয়। ১৮৮৭র ফেব্রুয়ারী মাসে প্রকাশিত হয় 'রাজর্ষি'। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে 'রাজর্ষি'র প্রথমাংশের ওপর ভিত্তি করে লেখা হয় 'বিসর্জন'। একইভাবে 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকের প্রকাশনা ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে 'বউঠাকুরাণীর হাট' অবলম্বন করে।

১৯০৩ খৃষ্টাব্দে লেখা হ'ল 'চোখের বালি'। 'নৌকাডুবি' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯০৬-এর সেপ্টেম্বরে। প্রকৃতপক্ষে 'চোখের বালি'তেই রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠা করেন আধুনিকত্ব। 'নৌকাডুবি'র পূর্বে 'চোখের বালি' লেখা হলেও, এখান থেকেই শুরু হয় রবীন্দ্রনাথের আধুনিকতা বিকাশের মহাযাত্রাপথ, যা ১৯৪০এ পৌঁছেও মন্থর হয়নি।

মহাকাব্যের বিশালতা নিয়ে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় 'গোরা'। ১৩১৪ থেকে

১৩১৬ সালের মধ্যে 'প্রবাসী'তে পর্যায়ক্রমে প্রকাশিত হয় এ উপন্যাস। 'চতুরঙ্গ' প্রকাশিত হয় ১৩২১ সালে 'সবুজপত্র' পত্রিকায়। ১৩২২ সালে এই পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয় 'ঘরে বাইরে'। 'ঘরে বাইরে'র পর ১৩৩৪-৩৫ সালে 'বিচিত্রা'তে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়ে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হ'ল 'শেষের কবিতা'। এই 'শেষের কবিতা' যখন লেখা হয়, তখন উপস্থিত হয়েছেন 'কল্লোল' পত্রিকার তথাকথিত আধুনিক লেখকরা। 'কল্লোলের একজন প্রতিনিধি লেখেন, —

> আমাদের আকাঙ্ক্ষা ছুটেছে তীক্ষ্ণতার দিকে, তীব্রতার দিকে, তার প্রভাবে তখন রবীন্দ্রনাথের রচনাকে বড্ড বেশি মৃদু বলে ঘোষণা করতে আমরা কুন্ঠিত হইনি। ঠিক এইরকম সময়ে রবীন্দ্রনাথের দুটি নতুন উপন্যাস বিভিন্ন মাসিকপত্রে পরপর দেখা দিল। কোনো গম্ভীর রাগিণীর আলাপের মত 'যোগাযোগ'-এর আরম্ভ, তাতে সাড়া দিতে একটু দেরী হল আমাদের, কিন্তু শেষের কবিতা'র প্রথম কিস্তি বেরোনমাত্র বিকিয়ে যেতে হলো।[১০]

সমাজচেতনা ও কালচেতনা 'গোরা'তে যেরকমভাবে উপস্থিত, রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী কোনো উপন্যাসে সে রকম নয়। কিছুটা ব্যতিক্রম অবশ্য 'যোগাযোগ'। পরবর্তী উপন্যাসগুলো মহিমান্বিত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যতায়। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য যেখানে প্রবল, সেখানে ব্যক্তির বাহ্যিক জীবনের থেকে বেশী প্রাধান্য লাভ করে মনোজীবন। মনোজীবন প্রাধান্য লাভ করলে, স্বাভাবিকভাবে উপন্যাস হয়ে ওঠে অন্তর্মুখি। 'চতুরঙ্গ' তার বিশেষ প্রমাণ। কিন্তু 'গোরা'তে একপেশে অন্তর্মুখিতা থাকা সম্ভব নয়। কেননা বিষয় বিস্তারের ও গভীরতার কারণে, দেশকালগত বৃহৎ পরিপ্রেক্ষিতের কারণে, এমন বিশালত্ব নিয়ে 'গোরা' উপন্যাস উপস্থিত হয়েছে – যা একমাত্র মহাকাব্যেই প্রত্যাশিত। এই কারণে অনেকে 'গোরা' কে 'এপিক উপন্যাস' বলেছেন। অন্যদিকে এই লেখায় দেশকাল এমন প্রত্যক্ষ, সেই সময়ের সমস্যা-সংকট এত প্রবলভাবে জীবন্ত যে অনেকেই 'গোরা'কে ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। —

> বিষয়-বিস্তার, এপিক ধর্ম, দেশকাল চিহ্নিত ঐতিহাসিকতা – গোরার এই বিশেষত্বগুলির কারণেই গোরা-তে একপেশে অন্তর্মুখিতা থাকা সম্ভব হয়নি।[১১]

বিশ শতকের আধুনিকতা একাধিক ধারা ও একাধিক লক্ষ্য নিয়ে বিদ্যমান। তারই একটি ধারা হচ্ছে বিশেষভাবে সমাজসচেতন এবং সামাজিক ঐতিহাসিক কর্ম প্রয়াসের সঙ্গে যুক্ত। কিছুটা জনগণ-অভিমুখী এই ধারা; আধুনিককালের উৎকন্ঠা এবং আকাঙ্ক্ষা, আশা ও কর্মের সঙ্গে এই ধারার গহন গভীর সম্পর্ক থাকায়, এই ধারা আধুনিক। বৃহৎ জাতীয় জীবনের সঙ্গে যুক্ত হবার আকাঙ্ক্ষা আধুনিকেরই আকাঙ্ক্ষা। 'গোরা'ও জাতীয় জীবনের বৃহৎ কর্মপ্রয়াসকে কেন্দ্র করে রচিত বলে তাকে সঙ্গত কারণেই আধুনিক আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। বিশ শতকে সোলেকভের 'And Quiet flows the Don' এই রকম এপিক ধারার আধুনিক উপন্যাস। আবার ঊনিশ শতকে টলষ্টয়ের 'War and Peace' অনেকটা একই ধারার আধুনিক উপন্যাস। অন্তর্জীবন ও বহির্জীবনের সামঞ্জস্য নিয়ে যুগোপযোগী ধ্রুপদী উপন্যাস 'গোরা' আধুনিক জীবনেরই সত্য।

'গোরা'র পরে প্রকাশিত হল 'চতুরঙ্গ'। এই উপন্যাসে প্রতীয়মান হলো যে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের ধারা নতুন খাতে বইতে শুরু করেছে। এমনকি তার ছোটগল্পও পূর্ব অপেক্ষা হয়ে উঠলো ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যমুখী এবং অন্তর্জীবনমুখী।

চতুরঙ্গে যে রকম অন্তর্জীবনের উপর জোর পড়েছে, এখানে সেখানে

দুই

> আধুনিক মানুষের সবচেয়ে বড় যন্ত্রণা এই যে, আজকের পৃথিবীতে অসহায়ভাবে সে কেন্দ্রচ্যুত। মানুষের রচিত সমস্তরকম বৃত্ত শিথিল হয়ে পড়েছে, অস্থির হয়ে উঠেছে জীবনের পরিধি। ফলে আধুনিক মানুষের কাছে সর্বজনবোধ্য বাস্তব গ্রহণযোগ্য থাকছে না আর; বরং নির্ভরতা না পেয়ে দৈনন্দিন থেকে দূরে দাঁড়িয়ে বিশ্বাসের কোনো ভিন্ন ভূমি খোঁজার তাগিদ প্রবল হয়ে উঠেছে বারবার।[১৪]

পরিচিত বাস্তবে মানুষের বিমুখতা, জীবনের শুদ্ধ সত্যরূপের প্রতি মানুষের অনাগ্রহ এবং বিকল্প বাস্তবের দিকে অগ্রসরতা বিশ শতকের প্রতীচ্য সাহিত্যের অন্যতম লক্ষণ। বাংলা কথাসাহিত্যে বিকল্প আধুনিকতাপূর্ণ 'বাস্তব' প্রতীচ্যকে অনুসরণ করতে দ্বিধা করেনি। একই রকম কথা আমরা দেখতে পাই কবি জীবনানন্দ দাশের লেখায়—

> কবিতা ও জীবন একই জিনিসের দুইরকম উৎসারণ; জীবন বলতে আমরা সচরাচর যা বুঝি তার ভিতর বাস্তব নামে আমরা সাধারণত যা জানি তা রয়েছে, কিন্তু এই অসংলগ্ন অব্যবস্থিত জীবনের দিকে তাকিয়ে কবির কল্পনা – প্রতিভা কিংবা মানুষের ইমাজিনেশন সম্পূর্ণভাবে তৃপ্ত হয় না। ...সাধারণত বাস্তব বলতে আমরা যা বুঝি তার সম্পূর্ণ পুনর্গঠণ তবুও কাব্যের ভিতর থাকে না; আমরা এক নতুন প্রদেশে প্রবেশ করছি।[১৫]

বাংলা কথাসাহিত্যে বাস্তবের রূপ বদল হতে দ্বিরুক্তি হয়নি আর জীবনের নানাস্তরের মাত্রা স্বীকার করে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিস্ময়কর উন্মোচন ঘটলো বাস্তবতারও। নতুন চেতনার ঘাত-প্রতিঘাত থেকে সৃষ্টি হতে থাকলো যে সব উপন্যাস, গল্প, কবিতা, নাটক, চিত্র বা ভাস্কর্য — বিস্ময়কর বাস্তবতা তাকে দিল এক আশ্চর্য অবয়ব। এই বিষয়ে বিশ শতকের অন্যতম প্রধান শিল্পী পাব্‌লো পিকাসো বলেছেন —

> Art is a falsehood through which one finds the truth...I attempt to reconstruct reality...My art alternates between gracefulness and horror, comedy and violence, reflecting the two extremes of society today[১৬]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পৃথিবীকে নানা সংকটের মুখে এনে ফেলেছিল। তার আগে এ দেশে চলেছিল নানা আন্দোলন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন বাংলাদেশের মানুষের চেতনায় এক নিগূঢ় প্রভাব ফেলে। বঙ্গভূমিকে দু'টুকরো করার চেষ্টার প্রতিবাদে সেদিন ঐক্যবদ্ধ বাংলাদেশ অহিংস আন্দোলনের বিপরীত এক পথের সন্ধান করেছিল যা সন্ত্রাসবাদ বলে চিহ্নিত। বিদেশী পণ্য বর্জনের দু:সাহসিক সিদ্ধান্ত নিতেও বাংলাদেশের আপামর মানুষ সেদিন দ্বিধা করেনি। বাংলাদেশের সর্বস্তরের মানুষের হৃদয়ে এক নব ভাবনার জোয়ার এসেছিল। কিন্তু ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে 'বঙ্গভঙ্গ' রহিত হওয়ায় ঐ প্রাণবন্ত চৈতন্য আচম্বিতে স্তিমিত হয়ে এলো। বাংলাদেশের এই মানস সংকটের রূপ রবীন্দ্রনাথের একটি লেখায় প্রতিভাত হল —

> বাংলাদেশে একদিন স্বদেশ প্রেমের বান ডাকিল; আমাদের প্রাণের ধারা হঠাৎ অসম্ভব রকম ফুলিয়া উঠিয়া পাড়ি ছাপাইয়া পড়ে আর কি। ...সেদিন সমাজটাও যেন আগাগোড়া নড়িয়া উঠিল এমনতরো বোধ হইয়াছিল। ...সেই বন্যার বেগ কমিয়া আসিয়াছে। সমাজের মধ্যে যে চলার ঝোঁক আসিয়াছিল

সেটা কাটিয়া গিয়া আজ আবার বাঁধা বোলের বেড়া বাঁধিবার দিন আসিয়াছে।[১৭]

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে এই লেখা। আবার এই ১৯১৪-তেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর একটি লেখায় নিখেছেন, ''দেশের নবযৌবনকে তাঁহারা (প্রাচীন 'সনাতন' পন্থী) আর নির্বাসিত করিয়া রাখিতে পারিবেন না। তারুণ্যের জয় হউক ...'' সবুজপত্রে উচ্চকন্ঠে উচ্চারিত হলো এই তারুণ্যের জয়। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে 'বিবেচনা ও অবিবেচনা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছেন — ''সমাজ মানুষগুলোকে লইয়া একান্ত পুতুলবাজির কারখানা খুলিয়াছে।''

এই ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের বৈশাখ মাসেই 'একটা নতুন কিছু করার জন্য নয়, বাঙালীর জীবনে যে নতুনত্ব এসেছে তাই পরিস্কার করে প্রকাশ করার জন্য' — সবুজপত্রের জন্ম।

আবার ১৯১৪ খৃষ্টাব্দেই শুরু হল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। বিশ্বের প্রধান সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীগুলোর অন্তর্নিহিত অন্তর্বিরোধ এবং চরম দ্বান্দ্বিক মনোভাবের মধ্যে দিয়েই এই বিশ্বযুদ্ধের সূচনা। ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদের ধ্বজাধারী রাষ্ট্রের আগ্রাসী চেতনার জন্য প্রথম বিশ্বযুদ্ধ মানব জীবনকে ওলোট-পালোট করতে বিলম্ব করেনি। সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগোষ্ঠীর মধ্যে সংঘাত জন্ম দেয় দ্বন্দ্বময় জটিলতার। সেই জটিলতাপূর্ণ সমস্যা কঠোরভাবে আক্রমণ করে বিশ্বমানবকে।

১৯১৮ খৃষ্টাব্দ। শেষ হল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। নানা নতুন নতুন সংকটের মধ্যে আবর্তিত হতে থাকে পরবর্তী কালগুলো। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ভারতবর্ষ যুদ্ধ থেকে দূরে থাকলেও, যুদ্ধের অভিশাপ থেকে পরিত্রাণ পায়নি। ভারতীয় সমাজ জীবন, সমগ্র মানবসত্তা, সাহিত্য সংস্কৃতি স্বাভাবিকভাবেই প্রভাবিত হয়েছে। আমাদের মনে পড়ে যায় ইলিয়া এরেনবুর্গের ইউরোপীয় সাহিত্যধারা সম্পর্কে মন্তব্য —

> The twilight of the West has passed. It was filled with vague shadows that around fearfulness and depression. Now the darkness of night has fallen there.[১৮]

অনেকটা চিরকালীন সত্যের মত 'fearfulness and depression' এবং 'Darkness of night' ভারতীয় সমাজ জীবনের অন্তস্থলে প্রোথিত করে তার শিকড়। ফলে যুদ্ধপূর্বকালীন সময়ে যে প্রবণতা নিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল কথাসাহিত্যের ধারা, যুদ্ধ-সমসময়ে এবং যুদ্ধ অবসানে আচম্বিতে সে বদলায় গতি। এক নব পালাবদলের নেশায় হয়ে ওঠে উন্মত্ত। শুধুমাত্র প্রতীচ্যের সাহিত্যধারা নব আধুনিকতার করাল গ্রাসে গ্রাসিত হয় না, সমস্ত বিশ্বকে ঐ আধুনিকতা তার ব্যাপ্ত বিস্তীর্ণ হাতের মুঠোয় বন্দী করে নেয়।

> এ আধুনিকতার স্থান এখন আর পাশ্চাত্যভূমিতে আবদ্ধ নয়, প্রায় সারা পৃথিবীতে বিস্তৃত। এ আধুনিকতাকে যদি ভাল বলি তাহলে সব দেশই, সব সভ্যতাই সেই ভালর কমবেশী শরিক, আর এ আধুনিকতাকে যদি ব্যাধি বলি, তাহলে একটি-দুটি সভ্যতা নয়, সভ্যতা ব্যাপারটাই আজ ব্যাধিগ্রস্ত।[১৯]

এই 'ব্যাধিগ্রস্ত' সভ্যতার কিংবা যুদ্ধময় সভ্যতার ফসল বুকে নিয়ে বাংলা কথাসাহিত্য জটিলতা, অন্তর্মুখীনতা, এবং বৈচিত্র্যের নানা রূপ পরিগ্রহ করে প্রকাশিত হয় নব আধুনিকতায়। শুরু হয় ঐতিহ্যের সঙ্গে সাম্প্রতিকের সংঘাত। ফেলে আসা আধুনিকতার সঙ্গে আগত আধুনিকতার বলিষ্ঠ সংঘর্ষ। আধুনিক মানুষ সৃষ্টি করে আধুনিক যুদ্ধ। এই আধুনিক যুদ্ধ চরমভাবে প্রকাশিত হয় আধুনিক বুদ্ধিজীবী মানুষের জীবনবোধ ও সংকটজনিত জটিলতা থেকে। যে কোনো দেশের কথাসাহিত্য, যূথবদ্ধ সমাজের সমাজচিন্তাকে সম্পূর্ণভাবে শুষে নিয়ে লাভ করে তার পূর্ণরূপ —

> জীবনই হলো সমস্ত শিল্প সৃষ্টির মৌলিক উপকরণ এবং ঔপন্যাসিক ছাড়া আর কেউই বোধহয় ততটা জীবনের মৌলিক উপকরণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ নন।[২০]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের চিহ্নিত চার বৎসর এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চিহ্নিত ছয় বৎসরের মধ্যে রচিত কথাসাহিত্য এবং দুই যুদ্ধ পরবর্তী কালগুলোর কথাসাহিত্য সমাজ ও জীবনের জটিলতা-সংকট থেকে স্বাভাবিকভাবেই মুক্তি পায় নি। সমাজ ও অর্থনীতির সংকট থেকে নির্গত কৃষ্ণচ্ছায়ার গূঢ় ভয়ঙ্কর প্রতিবিম্ব জীবনের সামগ্রিক অঞ্চলকে আবৃত করেছে, মিশে গেছে জীবনের গোপন অন্তস্থল অবধি। মানবসত্তার স্বভাবজাত নীতিবোধ, ভ্রান্তি, আবেগের চোরাস্রোত, চেতনার শুদ্ধতা ও অশুদ্ধতা, জীবন কাঠামো তৈরীতে অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব-সংঘাত, যুদ্ধের ঘনঘোরে তীব্র তির্যক স্ব-রূপ লাভ করে। সেই শ্বাসরুদ্ধ জীবন অনিবার্যভাবে প্রতিফলিত হয় সাহিত্যের সমকালে এবং উত্তরকালে। এই প্রতিফলন বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয় কথাসাহিত্যে। —

> সমস্ত মিশ্র-শিল্পের মধ্যে উপন্যাসই সবচেয়ে বেশি মিশ্র। কারণ, পরিচিত মানুষজনের কীর্তিকলাপ আবেগ-সংরাগ, দ্বন্দ্ব-সংঘাত, প্রতিদিনের ব্যবহৃত ভাষায় ঔপন্যাসিক প্রকাশ করেন। জীবনের নৈতিক সংকট, ঘটনা ও পরিস্থিতি ঔপন্যাসিকের আলোচ্য বিষয়। কাজেই মানুষ যে নৈতিক এবং আবেগগত বিক্ষোভের পরিসীমার মধ্যে থাকে এবং আচার-আচরণগত যে সমস্যা তাকে প্রতিদিন পীড়িত করে তার সঙ্গেই উপন্যাসের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক। সমস্যা ছাড়া যেমন জীবন নেই তেমনি কোন উপন্যাসও বোধহয় নেই।[২১]

এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা সংক্ষেপে দেখে নেবো, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ববর্তী সময়ে বিশ্বের এবং ভারতবর্ষের পরিস্থিতি। দেখবো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক পর্বে দেশ ও মানুষ কি ভাবে সংঘাতে জর্জরিত হয়েছে, —

> পৃথিবীতে জন্মলাভ করেছে এক নতুন যুগ, যে যুগের মৌল বিরোধ হয়ে উঠেছে – একদিকে মুমূর্ষু ধনতন্ত্র অন্যদিকে গতিষ্ণু সমাজতন্ত্রের মধ্যে বিরোধ।[২২]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ১৯১৮তে শেষ হবার পর ১৯১৯ এর ২৮শে জুন, অর্থাৎ সাত মাস পরে স্বাক্ষরিত হয় জার্মানীর সঙ্গে ভার্সাই সন্ধি। কিন্তু তার মাত্র কিছুদিন পূর্বে ১৯১৯ এর ৩রা মার্চ বৃটিশ শাসক ভারতের বুকে চাপিয়ে দিয়েছে নির্মম নিষ্ঠুর দমন নীতির জ্বলজ্বলে প্রতীক 'রাওলাত আইন'। এই 'রাওলাত আইন' এর প্রতিবাদে আমরা পেলাম প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিতকালে জাতীয় আন্দোলনের প্রথম রূপরেখা। ১৯১৯ এর ডিসেম্বরে মন্টেগু চেমসফোর্ডের সংস্কার পরিকল্পনায় বাংলাদেশে শুরু হল অন্য এক সংকট। এই সংস্কার পরিকল্পনায় প্রদেশগুলো অনেকাংশে স্বায়ত্ব শাসনের অধিকার পেলেও, বাংলাদেশ মুখোমুখি হল দু:সহ অর্থনৈতিক সংকটের।

ভারতবর্ষ জুড়ে দেখা দিল প্রতিবাদী আন্দোলন, একটানা হরতাল, সত্যাগ্রহ, নানা গণআন্দোলনের জোয়ার। 'রাওলাত আইন' এর প্রতিবাদে সমগ্র দেশ বিক্ষোভে সংহত হল জালিয়ানওয়ালাবাগের বিশাল জনসভায়। মানব সভ্যতার ইতিহাসকে কলঙ্কিত করে, নৃশংসভাবে গুলি চালিয়ে হত্যা করা হল অগণিত নিরীহ ভারতবাসীকে। উত্তাল হয়ে উঠল সমগ্র জাতির দীর্ঘদিনের অবরুদ্ধ বিক্ষোভ। বেদনায়, ঘৃণায় নাইট উপাধি ত্যাগ করলেন রবীন্দ্রনাথ।

বৎসর শেষ হতেই ১৯২০ খৃষ্টাব্দে সংঘটিত হল খিলাফত আন্দোলন ও অসহযোগ আন্দোলন। অসহযোগ আন্দোলন পূর্ণরূপ পেল ১৯২১ খৃষ্টাব্দে। অন্যদিকে ভার্সাই সন্ধি স্বাক্ষরিত হবার পর, এ

বছরেই ২৮শে জুলাই হিটলার হন জার্মানীর প্রথম চেয়ারম্যান। – এদিকে বাংলাদেশে তখন অসহযোগ আন্দোলন বিপুল উদ্দীপনায় জমাট বেঁধেছে রবীন্দ্রনাথ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন প্রমুখ বুদ্ধিজীবীদের সহৃদয় নির্দেশের মান্যতায়। ইটালিতে ১৯২২ খৃষ্টাব্দে আবির্ভাব হয় ফ্যাসিষ্ট নেতা মুসোলিনির। ১৯২৩ শে বাংলাদেশে প্রকাশিত হয় 'কল্লোল' পত্রিকা। ১৯২৪ এর পয়লা ফেব্রুয়ারী সোভিয়েত ইউনিয়নকে বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয় বৃটেন।

১৯২৪ এ প্রবীণ রবীন্দ্রনাথকে সইতে হলো বেশ বড় রকমের প্রত্যাখ্যান। চীনা ভাবুক এবং যুব সম্প্রদায় সহজভাবে মানতে পারলেন না তাঁকে, খুবই স্পষ্ট হয়ে উঠলো তাদের প্রতিবাদের আচরণ। চীনারা মনে করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ সেখানে বিস্তার করতে গিয়েছিলেন এক হিন্দুছলা, প্রগতির পরিপন্থী এক কর্মহীনতার বাণী, ঐতিহ্যবিলাস। এরই মধ্যে কেউ কেউ খুঁজে পেলেন সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্ত। কেউ কেউ সাবধান করে দিয়ে বললেন যে এই নবকীর্তিত 'প্রাচ্য সভ্যতার' কিছুই তারা চান না। এমনই প্রকাশ্য হয়ে দাঁড়াল এইসব বিদ্রোহ বা অসহযোগ যে খানিকটা থমকে গেলেন কবি। এমনকি তাঁকে বাতিল করে দিতে হল তাঁর পূর্বঘোষিত কয়েক দিনের সভা। সাংহাই বা পিকিঙের তিক্ত অভিজ্ঞতার পর হ্যাংকাও পৌঁছেও তাঁকে শুনতে হল সেই রূঢ় চিৎকার — 'ফিরে যাও পরাভূত দেশের ক্রীতদাস, ফিরে যাও'। — ফিরেই এলেন রবীন্দ্রনাথ অল্পদিন পর। চীন দেশের মানুষের প্রতি এই রইল তার শেষ বিদায় বাণী — ''নিজের দেশ থেকে এই দূরের দেশ পর্যন্ত দুর্ভাগ্য আমাকে কেবলই তাড়া করেছে।''[২৩]

'নিজের দেশ'-এ ১৯২৪ এ তখন কল্লোল পত্রিকার রবীন্দ্রবিরোধিতা। আবার ১৯২৪ এর ৬ই নভেম্বর রবীন্দ্রনাথ পৌঁছলেন বুয়েনস আইরেসে, 'পূরবী'র পথিক কবিতাগুলি লিখতে লিখতে। ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর আতিথ্যে কবি যেন গ্রহণ করলেন পৃথিবীর নির্মল মুক্ত বাতাস। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দ যেমন রবীন্দ্রনাথের জীবনে ঠিক তেমনই বাংলা কাব্য-সাহিত্যের জগতের কাছে অর্জন করে নিল এক গুরুত্বপূর্ণ বিশিষ্টতা।

১৯২৮ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারী বয়কট করা হল সাইমন কমিশন। ১৯২৮ থেকে ১৯২৯ সাল শ্রমিক শ্রেণীর জাগরণের কাল হয়ে চিহ্নিত হয় ইতিহাসে। ১৯৩০ সালের ১২ই মার্চ গুজরাটে শুরু হয় লবণ আইন আন্দোলন।

বিশ্ব পরিস্থিতির উত্তাল অবস্থা থেকে বাংলাদেশের সংকটপূর্ণ পরিস্থিতি কোনো অংশে তখন কম নয়। ঔপনিবেশিক জীবন তখন প্রত্যক্ষ ভয়াবহ সংকটের মুখোমুখি। ফলে সেই সমকালে কথাশিল্পীরা কথাসাহিত্যে যে জীবন গ্রহণ করেন তা জটিল হতে বাধ্য। কারণ,—

> Novelists deliberately use their art for life, carefully analysing the complexities and conflicts of life's sake and suggesting solutions even though they do not offer complete remedies.[২৪]

স্বাভাবিকভাবেই দেখা যাচ্ছে ১৯১৮ থেকে ১৯৩০ সাল অবধি অর্থাৎ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পরবর্তী ১২ বছর অর্জন করেছে এক গুরুত্বপূর্ণ বিশিষ্টতা। ইতোমধ্যে বাংলাদেশে অহিংস-অসহযোগ আন্দোলনের পাশাপাশি শুরু হয় সহিংস-সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন। জাতীয় আন্দোলনের অঙ্গ হিসাবে যাকে কখনো কংগ্রেস স্বীকার করেনি। সহিংস আন্দোলন কংগ্রেসের আন্দোলন থেকে ভিন্ন গোত্রের হলেও, জনসাধারণ এই আন্দোলনকে জাতীয় আন্দোলনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করেছে — এ বিষয়ে এখন আর সন্দেহের অবকাশ নেই। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সূচনা হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে, সারা

164074 31 DEC 2003

দেশ জুড়ে বেকার সমস্যার তীব্রতা; অস্থির জীবন প্রবাহ, চাঞ্চল্য এবং হতাশার রূপান্তরিত রূপ হিসাবেই। এ ছাড়া লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গের জন্য গভীর ষড়যন্ত্রময় প্রয়াস, বেকার সমস্যার সমাধানহীন রূপ, বাঙলার মানুষকে ছলে-বলে-কৌশলে উচ্চশিক্ষা থেকে নিবৃত্ত করার জন্য ব্রিটিশের ঔপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যবাদী প্রয়াস, জাতীয় চরিত্রকে কলঙ্কিত করার উদ্যোগ, সবকিছু মিলিয়ে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপিত হয়।

ব্রিটিশের নারকীয় দমননীতি ও ঔপনিবেশিক হাতকড়ি থেকে মুক্তির আর্তিতে বাংলাদেশের বুকে ছোট ছোট গুপ্ত সমিতির গঠন, ১৯২০ থেকে ১৯২৪ সালে বিভিন্ন ডাকঘরে অগ্নিসংযোগ, ১৯২৪ থেকে ১৯৩০ সালের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের চরম উৎকন্ঠার সৃষ্টি করে চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার, সরকারী কোষাগার ইত্যাদি লুন্ঠন-আক্রমণের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন এক বিশেষ আকার ধারণ করে।

এরই মধ্যে ভারতবর্ষে গড়ে ওঠে কমিউনিষ্ট পার্টি। ১৯১৭ সালে লেনিনের নেতৃত্বে রাশিয়ায় সর্বহারা বিপ্লবের সূত্রে, ১৯২৯ সালে গঠিত হয় তৃতীয় কমিউনিষ্ট ইন্টারন্যাশনাল। সেই প্রেরণায় ভারতের মজদুররা ধর্মঘট করে। কিন্তু ব্রিটিশ শাসক এই পার্টির সৃষ্টি অবস্থা থেকেই দমন-নীতির দন্ডে এই পার্টিকে চিহ্নিত করে রাখে। মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার মাধ্যমে এই চিহ্নিতকরণ চলে ১৯২২ থেকে ১৯২৯ সাল অবধি। অবশেষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ১৯৩৪ সালে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টিকে বে-আইনী বলে ঘোষণা করে।

১৯৩০ সালের পর থেকে হিটলার তার একনায়কতান্ত্রিক ক্ষমতালিপ্সু হাত বাড়ায়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ দমননীতির সাহায্যে কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে সৃষ্টি করে ত্রাস। মুসোলিনী ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে চরম দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে দ্বিধা করে না। হিটলার তার আগ্রাসী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে গুরুত্বপূর্ণ চুক্তিগুলোকে যেমন অস্বীকার করে তেমনভাবে অবমাননা করতেও দ্বিধা করে না। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র শক্তি সঞ্চয় করছে এই শঙ্কায়-ভীতিতে, প্রতিবেশি রাষ্ট্র পোলান্ডের প্রতি হিটলারের আগ্রাসী মনোভাব; ইত্যাদি নানাবিধ কারণ যখন বিশ্ব পরিস্থিতিকে উত্তাল করে তোলে, তখন ১৯৩৯ সাল। পয়লা সেপ্টেম্বর অবশ্যাম্ভাবিরূপে শুরু হয়ে গেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ।

তিন

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকাল থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ববর্তী সময় পর্যন্ত বিশ্বের এবং বিশেষ করে বাংলাদেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পরিস্থিতির সংক্ষিপ্ত রূপরেখা ইতোমধ্যে আমরা দেখেছি। বিশ্বে তখন একপ্রান্তে জমাট বাঁধছে হতাশা, অবিশ্বাস, অনিশ্চয়তা; অন্যপ্রান্তে – 'যা কিছু পুরোনো তাই অনুভবহীন' ভাবনায় উদ্বেলিত, নতুন মূল্যবোধে জারিত জীবনাকাঙ্ক্ষার তীব্র তৃষ্ণা। 'পুরোনো' কে অস্বীকার – উপেক্ষার বিশাল আয়োজন। ১৯২৩ সালে অর্থাৎ ১৩৩০ এর বৈশাখ মাসে 'কল্লোল' পত্রিকার প্রথম প্রকাশ জানিয়ে দেয় – তাঁরা নতুন ভাবনার প্রতিনিধি। 'পুরোনো' কে প্রত্যাখ্যান করে আধুনিকতার নবমাত্রায় তাঁরা বিশ্বাসী; বাস্তবতা ও নীতিবোধ, মানবিক সম্পর্কের কলুষতা ও সৌন্দর্য চেতনার দ্বন্দকে নতুন মাত্রা দেওয়ার প্রয়াসী। ১৩১১ সালের পর পুনরায় রবীন্দ্রবিরোধীতার তীব্র আস্ফালন নিয়ে শোনা গেল 'কল্লোল'-এর কলধ্বনি।

> রবীন্দ্রনাথ থেকে সরে এসেছিল 'কল্লোল'। সরে এসেছিল অপজাত ও অবজ্ঞাত মনুষ্যত্বের জনতায়। নিম্নগত মধ্যবিত্তের সংসারে। কয়লাকুঠিতে, খোলার বস্তিতে, ফুটপাতে। প্রতারিত ও পরিত্যক্তের এলাকায়।[২৫]

বাংলা কথাসাহিত্যের প্রথাগত পথ ছেড়ে, যৌন মনস্তত্ব এবং দারিদ্র্যের অভিজ্ঞতাকে সঙ্গী করে 'প্রবল প্রাণোচ্ছাস' সহ যাত্রা শুরু হল কল্লোলের। মানুষের অসম্পূর্ণ অস্তিত্ব, খন্ডিত অস্তিত্ব নিয়ে তখনকার লেখকদের কলমে মানুষের শূন্যতা ও একাকিত্বের ব্যাপ্ত অভিজ্ঞতার চিত্র অঙ্কিত হতে থাকলো 'কল্লোল' এর উদ্দামতার মধ্য দিয়েই।

> কল্লোল বললেই বুঝতে পারি সেটা কি। উদ্ধত যৌবনের ফেনিল উদ্দামতা, সমস্ত বাধা বন্ধনের বিরুদ্ধে নির্ধারিত বিদ্রোহ, স্থবির সমাজের পচা ভিত্তিকে উৎখাত করার আলোড়ন।[২৬]

যে 'ফেনিল উদ্দামতা' নিয়ে 'কল্লোল' পত্রিকা প্রকাশিত হয়, সেই নতুন মূল্যবোধাক্রান্ত প্রাণের সজীবতায় একই সময়ে অর্থাৎ ১৯৩০ এর বৈশাখ মাসেই শ্রমিক জীবনের মুখপাত্ররূপে প্রকাশিত হয় 'সংহতি' পত্রিকা। পৃথিবীর বাতাস যুদ্ধের ধোঁয়ায় ভারাক্রান্ত। এক দ্বন্দ্বময় পরিস্থিতি নিয়ে এসেছে ঔদাসীন্য, নৈরাশ্য এবং আকাঙ্ক্ষিত ছিন্নতার নব-বাস্তব রূপ। নীতিবোধ, যুক্তিতে প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্য; তথাকথিত শুচিতার শুদ্ধমানস, নান্দনিক মননের পুরোনো বৃত্ত ভেঙে তৈরী হয়েছে নতুন জীবনবোধ। মানবসভ্যতার অন্তর্মূলে মৃত্যু ও ধ্বংস, বিদ্বেষ ও নাস্তিবোধ তার শিকড় প্রসারিত করে অক্টোপাশের বাহুর মতো নববলয়ে শৃঙ্খলিত করে ফেলেছে যাবতীয় মঙ্গলময় অনুভব।

প্রসঙ্গান্তর মনে হলেও, অন্তত এই কালের বিশ্লেষণের সময় উল্লেখের প্রয়োজন রয়েছে। মানবসভ্যতার ঐক্যের ধারণায়, সর্বমানবিক শিক্ষার ধারণায়, রবীন্দ্রনাথ ততোদিনে, ১৯২১ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠা করেছেন বিশ্বভারতী। ১৯২২ সালে শিক্ষাকে সর্বাঙ্গীণ জীবনযাত্রার সঙ্গে যুক্ত করার জন্য প্রতিষ্ঠা করেছেন শ্রীনিকেতন। লোকশিক্ষার ভাবনাকে মূর্তরূপ দেবার জন্য রবীন্দ্রনাথ শুরু করেছেন অন্য এক মহান কর্মযজ্ঞ। প্রতিষ্ঠা করেছেন 'শিক্ষাসত্র'। ঔপনিবেশিক শিক্ষার শৃঙ্খল মোচনের জন্য উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে তাঁর হৃদয়।

এমন এক সময়ে এই প্রয়াস যখন ঔপনিবেশিক শাসনের শ্বাসরুদ্ধকারী চাপে পুরোনো আর্থসামাজিক কাঠামো বিধ্বস্ত। সমকালীন বাস্তবতা বাংলাদেশের নতুন প্রজন্মের কাছে বিচিত্র চরিত্র নিয়ে তখন প্রতিভাত। বিশেষভাবে বাংলাদেশের আধুনিক প্রজন্ম জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংকটের মুখোমুখি হয়ে গ্রহণ করলো

দ্রুত রূপান্তরিত চেতনা। 'কল্লোল গোষ্ঠী' এই দ্রুত রূপান্তরিত চেতনাকে কথাসাহিত্যে প্রকাশ করে গ্রহণ করলো নববাস্তবতার অগ্রজ আসন। 'কল্লোল'—এর ভাবনার প্রতিধ্বনি – প্রতিফলন ঘটলো 'কালিকলম' (১৩৩৩), প্রগতি (১৩৩৪), বিচিত্রা, ধূমকেতু ইত্যাদি পত্রিকায়। বাংলা কথাসাহিত্য কল্লোল, কালিকলম, প্রগতি প্রমুখ পত্রিকাকে কেন্দ্র করে অর্জন করলো চেতনার এক নতুন মাত্রা।

> চিরাচরিত পদ্ধতি ও বিচারহীন সংস্কারের ফলশ্রুতি হিসেবে যে ভালো-মন্দ, উচিত-অনুচিত, বস্তু-সত্তার বোধ গ্রাহ্য ছিলো এতদিন, নতুন প্রজন্ম তাকে মিথ্যা, ঝাপসা, চতুর ও বন্ধ্যা বলে বর্জন করতে চাইলো।[২৭]

রবীন্দ্র বিরোধিতার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নয়। তবু কালের মাত্রাকে যথাযথভাবে উপস্থিত করার জন্য, রবীন্দ্র বিরোধিতার প্রসঙ্গ কোনোভাবেই এড়ানো সম্ভব নয়। কেননা, রূপান্তরিত চেতনার কথা উল্লেখ করলেই স্বাভাবিকভাবেই এসে যায় রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ও মননের জগৎ। ১৩১১ বঙ্গাব্দের শেষভাগে আমরা রবীন্দ্রবিরোধিতার কথা জানি। দ্বিজেন্দ্রলাল, সুরেশ সমাজপতি, বিপিন চন্দ্র পাল প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ থেকে শুরু করে অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায় পর্যন্ত সুধীজন রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি সম্পর্কে যে সব অভিযোগ করেছেন তা মনে পড়ে যায়। রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্য এবং কাব্য অস্পষ্ট, দুর্নীতিপূর্ণ এবং অবাস্তব, এই ছিলো তাঁদের অভিযোগের মূল বিষয়। রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের মতে—

> ''রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি'তে যে বাস্তবের সহিত আমরা পরিচিত হই, তাহাতে শুধুই রক্তমাংস-ইন্দ্রিয় লালসার নগ্ন ও কুৎসিৎ মূর্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে। বাস্তব এখানে রক্তমাংসের, ভোগ-লালসার; সুতরাং ইহা অনিত্য, মিথ্যা ও সমাজদ্রোহী।''[২৮]

এই বিরুদ্ধ স্রোত রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার কাছে পরাজিত হয়ে রবীন্দ্রনাথকে প্রতিষ্ঠা করেছে কালের যাত্রায়। 'চোখের বালি' বাংলা কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে আধুনিকতার প্রথম স্পষ্ট নিদর্শন একথা আমরা প্রথম অনুচ্ছেদেই দেখিয়েছি। সুধীন্দ্রনাথ তাঁকে বাংলা সাহিত্যের 'পিতৃপদবাচ্য' আখ্যা দিলেও সেদিনের 'কল্লোল' গোষ্ঠী কিন্তু রবীন্দ্রনাথের জীবনের অন্তর্নিহিত মৌলনীতি ও প্রত্যয় গ্রহণ করতে পারেনি। তাঁদের বিশ্বাসের শিথিলতা, চিত্তর অস্থিরতা, 'বিদ্রোহী' বেপরোয়া মননের কাছে কালের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ রবীন্দ্রনাথের জীবনবোধ এবং শিল্পসৃষ্টিচেতনার প্রবাহ 'যুগোপযোগী' বলে স্বীকার করতে চাইলো না। তরুণ প্রজন্ম রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকে আখ্যা দিলো "Classical" তরুণ লেখক গোষ্ঠীর অসন্তোষ প্রকাশ পেলো শুধু কাব্য সৃষ্টিতে নয়, কথা সাহিত্যের প্রতিও। এই তরুনরা 'পরিত্যক্ত'র এলাকায় রাখলেন রবীন্দ্রনাথের কাব্যের আদর্শনিষ্ঠা এবং শরীরসর্বস্ব চেতনার উর্ধে বিচরিত দিব্যপ্রেম-চেতনার গভীর সৃষ্টি চৈতন্যকে। তরুণ প্রজন্ম তাঁর উপন্যাসের দৃষ্টিভঙ্গিকে বহুলাংশে 'অবাস্তব' বলতে দ্বিধা করলেন না। যে সময়ে এই তরুণরা রবীন্দ্রবিরোধিতার আঁচে নিজেদের উত্তপ্ত করছেন, তার বহুপূর্বেই কিন্তু প্রকাশিত হয়েছে, 'চোখের বালি' (১৩০৮—১৩০৯, বঙ্গদর্শন), 'নষ্টনীড়' (১৩০৮), চতুরঙ্গ (১৩২১) ও ঘরে বাইরে (১৩২২)।

তবু 'কল্লোল' —এর লেখকেরা তর্জনী তুলে বললেন, 'বিনোদিনী'র চরিত্র 'শুচিতায় ভরা'।

> ...কথাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের সবটুকু দান এক করিয়া বিচার করিলেও মনে হয় যে, রবীন্দ্রনাথ জীবনের একটা দিক্ বাদ দিয়া গিয়াছেন, তাঁহার সুচিত্রিত চরিত্রগুলির সকলেই যেন শুচিতায় ভরা, এমনকি বিনোদিনীর মধ্যেও পঙ্কিলতা নেই। মানুষ যেখানে সর্বাঙ্গে কাদা মাখিয়া বসিয়া আছে – হয়ত

> তাহার অন্তরের গূঢ়তম প্রদেশে সত্যের স্ফুলিঙ্গটুকু বাঁচিয়া আছে মাত্র – সেখানে আমরা রবীন্দ্রনাথকে পাই না ।[২৯]

প্রবীণরা রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের মূল্য বা গুরুত্ব সম্পর্কে প্রকাশ করেছেন সংশয় – অনাস্থাপূর্ণ – আঘাতকারী মন্তব্য। নবীনরা করেছেন 'বিদ্রোহ'। ভবানী ভট্টাচার্য বলেছেন – রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের চরিত্ররা 'শুচিতায় ভরা'। কিন্তু অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায় তাঁর 'সাহিত্য সমালোচনার মাপকাঠি' প্রবন্ধে মন্তব্য করেছেন, 'কামপ্রবৃত্তির পোষাকী রূপ' — এই ছিল তখনকার প্রবীণ ও নবীনদের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য।

কাব্যের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ থেকে সরে এসে সাহিত্য সৃষ্টির প্রবাহ অর্জন করলো এক স্বতন্ত্রতা। নজরুলের বিদ্রোহী অশান্ত যৌবনধর্মের ধ্বজা, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের মেধাদ্যুতিপূর্ণ দু:খবাদ, মোহিতলাল মজুমদারের দীপ্ত-দৃঢ় দেহাত্মবাদ সামনে রেখে রবীন্দ্রনাথ থেকে স্বতন্ত্রতার সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলো উদ্দাম উদ্দীপ্ত 'কল্লোল' গোষ্ঠী।

> তাঁর কাব্যে বাস্তবের ঘনিষ্ঠতা নেই, সংরাগের তীব্রতা নেই, নেই জীবনের জ্বালাযন্ত্রণার চিহ্ন, মনে হলো তাঁর জীবন-দর্শনে মানুষের অনতিক্রম্য শরীরটাকে তিনি অন্যায়ভাবে উপেক্ষা করে গেছেন ।[৩০]

— এই মন্তব্য সাধারণভাবে রবীন্দ্রনাথের জীবনবোধ সম্পর্কে 'কল্লোল' গোষ্ঠীর তরুণ প্রজন্মের মনোভাব।

এই বিরোধিতা যে মুখ্যত তাঁর কথাসাহিত্যের জন্যই তা সম্ভবত বলা যাবে না। যেখানে রবীন্দ্রনাথ অপ্রতিরোধ্য, প্রতিদ্বন্দ্বীহীন সেই কাব্যের ক্ষেত্রেই মূলত এই মনোভাব। রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করার আকাঙ্ক্ষা সুস্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ হচ্ছিল এই বিরোধিতায়। কেননা রবীন্দ্রনাথ কাব্যে যতখানি অপ্রতিদ্বন্দ্বী, অপ্রতিরোধ্য – কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে তেমন নন্। কারণ রবীন্দ্রনাথের সমকালেই শরৎচন্দ্র বাংলা কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে অর্জন করেছেন ব্যাপক জনপ্রিয়তা। কথাসাহিত্যে জনপ্রিয়তা এবং উত্তরসূরীদের প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের সমপর্যায়েই ছিলেন শরৎচন্দ্র।

'কল্লোল'–এর কলধ্বনি শোনার বহুপূর্ব থেকেই শরৎচন্দ্র বাংলা কথাসাহিত্যের পাঠক মহলে পরিচিত। রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' প্রকাশের সামান্য কাল পরে, কিন্তু, 'চতুরঙ্গ' প্রকাশের অল্পকাল আগেই পাঠক মহলে প্রবেশ করেছেন শরৎচন্দ্র। ১৯১৬ তে প্রকাশিত হয়েছে 'চতুরঙ্গ'। অর্থাৎ পাঠক মহলে তাঁর পরিচিতি ১৯১৩-১৪ সাল থেকেই। ১৯১৭ সালে দেবদাস, নিষ্কৃতি, শ্রীকান্ত (প্রথম পর্ব), চরিত্রহীন প্রকাশিত হয়ে শরৎচন্দ্রকে বাংলা কথাসাহিত্যে 'পরিচিত' থেকে পৌঁছে দিয়েছে প্রতিষ্ঠায়। 'কল্লোল'–এর প্রধান লেখকরা যখন কৈশোর কাল পার করেননি, তখনই শরৎচন্দ্র বাংলা কথাসাহিত্যে খুঁজে পেয়েছেন নিজস্ব পথ। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায় — অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের জন্ম ১৯০৩ সালে, প্রেমেন্দ্র মিত্রের জন্ম ১৯০৪ সালে, বুদ্ধদেব বসুর জন্ম ১৯০৮ সালে। তবু কালের প্রবাহ আমাদের দেখিয়ে দেয় যে 'কল্লোল'– এর সঙ্গে কিভাবে সেই প্রবীণ শরৎচন্দ্রেরই গড়ে ওঠে এক আত্মিক নিবিড়তা। তখন কিন্তু 'কল্লোল' বলতে বোঝাত বিদ্রোহ এবং রবীন্দ্র-বিরোধিতা। বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক' প্রবন্ধে বলেছেন—

> যাকে কল্লোল যুগ বলা হয় তার প্রধান লক্ষণই বিদ্রোহ, আর সে বিদ্রোহের প্রধান লক্ষ্যই রবীন্দ্রনাথ।[৩১]

তাই 'বিচিত্রা' পত্রিকার ১৩৩৪-এর শ্রাবণ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ 'সাহিত্যধর্ম' প্রবন্ধে 'ল্যাঙট-পরা

গুলি পাকানো ধুলোমাখা আধুনিকতা' কে করলেন তীব্র আক্রমণ। বাদ-প্রতিবাদে মথিত হয়ে উঠলো বাংলা সাহিত্য জগৎ। ঠিক দু'মাস পরে 'বঙ্গবাণী' পত্রিকার আশ্বিন সংখ্যায় শরৎচন্দ্র তাঁর 'সাহিত্যের রীতি-নীতি' প্রবন্ধে আধুনিকদের পক্ষাবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের আধুনিকতার তত্ত্বকে শানিত কলমে ক্ষত-বিক্ষত করলেন। অথচ শরৎচন্দ্র তখন তরুণ নন। রবীন্দ্রনাথের আক্রমণের লক্ষ্যও তিনি ছিলেন না। তবুও রবীন্দ্রনাথের তিরস্কার যেন অলক্ষ্যে শরৎচন্দ্রকে আঘাত হেনেছিল। ঐ সময়ই (১৩৩৪-এ) তাঁর প্রবন্ধ সম্পর্কে রাধারাণীদেবীকে চিঠিতে জানান যে — নবীন লেখকদের প্রতি তিনি ছিলেন যথেষ্ট স্নহপ্রবণ। যেহেতু তারা নবীন লেখক সেহেতু তাদের কিছু ত্রুটি বিচ্যুতিও হয়তো ছিল কিন্তু এই অপরাধে তাদের অশ্রদ্ধা এবং অবজ্ঞা করাটা তাঁর কাছে খুবই বেদনাদায়ক বলে মনে হয়েছে।

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তকে একইভাবে আহত করেছিল রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যধর্ম'। অবশ্য শরৎচন্দ্রের তুলনায় অনেক তরুণ ছিলেন নরেশচন্দ্র। তরুণদের থেকে খুব বেশী নয় তাঁর দূরত্ব যতটা ছিল শরৎচন্দ্রের। কিন্তু তরুণ প্রজন্মের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের আত্মিক নৈকট্য কতটা প্রবল ছিল তার বিশ্লেষণে অচিন্তকুমারের একটি মন্তব্য খুবই প্রাসঙ্গিক —

> আজ সেই ছবিটির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছি। শরৎচন্দ্রের খুব বেশি ছবি আছে বলে মনে হয় না। কিন্তু 'কল্লোল'-এর পৃষ্ঠায় এটি যা আছে, তার তুলনা নেই। পরবর্তী যুগের ক'জন প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তিহীন নতুন লেখকের সঙ্গে তিনি যে তাঁর আত্মার নিবিড় নৈকট্য অনুভব করেছিলেন তারই স্বীকৃতি এ ছবিতে সুস্পষ্ট হয়ে আছে।[৩২]

'কল্লোল'-এর কথাসাহিত্যের প্রেরণা শুধু বাঙালী নিম্ন মধ্যবিত্তের আর্থিক বিপর্যয় কিংবা কন্টিনেন্টাল সাহিত্যের অন্ধকার পৃষ্ঠা থেকে উঠে আসেনি। যদিও সুকুমার সেন লিখেছেন—

> কন্টিনেন্টাল উপন্যাসের প্রভাবে এবং নিম্ন-মধ্যবিত্তের আর্থিক দুর্গতির চাপে রোমান্টিক কল্পনাবিলাস প্রবলতর হইয়া তরুণ লেখকদের এক সম্প্রদায়ের মধ্যে যেন বস্তি-বিলাস হইয়া দাঁড়াইল।[৩৩]

তবু আজ এ কথা সত্য বলে মেনে নিতে দ্বিধা হয় না যে শরৎচন্দ্রের মধ্যেও 'কল্লোল'—এর লেখকেরা পেয়েছিলেন তাঁদের সাহিত্যাদর্শের বীজ।

শরৎচন্দ্রের প্রথম গ্রন্থ 'বড়দিদি' ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। শেষ সম্পূর্ণ গ্রন্থ 'বিপ্রদাস' প্রকাশিত হয় ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে। যখন রবীন্দ্রনাথ গোরা থেকে পৌঁছতে চলেছেন চতুরঙ্গে, সেই সময় 'বড়দিদি' নিয়ে যাত্রা শুরু করেন শরৎচন্দ্র। ধীরে ধীরে শরৎচন্দ্রের রচনা আমাদের আহত জীবনকে, ক্ষুব্ধ বোধকে শুশ্রুষা করে, নিপুণভাবে তাঁকে এনে দিলো সাহিত্যের জয়মাল্য। বাস্তব পটভূমিতে জীবনচিত্র বিন্যস্ত করে, শরৎচন্দ্র অধিকার করে নিলেন তরুণ প্রজন্মের হৃদয়। 'পরিপূর্ণ-মনুষ্যত্ব'-র জন্য যাবতীয় প্রচলিত সংস্কার ভাঙতে সক্রিয় হয়ে উঠেছে তাঁর লেখনী। 'কল্লোল'—এর প্রবীণ সদস্য প্রথিতযশা শিল্পী জগদীশচন্দ্র গুপ্ত 'কালি কলম'-এর ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের ভাদ্র সংখ্যায় লিখতে দ্বিধা করেননি —

> এমন করিয়া আগে তো অপ্রকাশকে কেহ উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেয় নাই। —কথা ছিল, শিল্প ছিল, ছিল না দরদ। অপরের মনের কথাটি বুনিয়া বুনিয়া বাছিয়া বাছিয়া হয়তো বলা হইয়াছিল, কিন্তু সে শুধু অনুভূতির বহিরঙ্গ স্পর্শ করিত। ...জীবানন্দ, ষোড়শী, অভয়া, অচলা, বামুনের মেয়েটি আর কিরণময়ী — ইহারা আছে বলিয়া জানিতাম। — এ ছাড়া আরো আরো আছে। এবং সাহিত্যে তারা দেখা দিবেনও।[৩৪]

— ঠিক সময়মতো তারা দেখা দিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্রের মধ্যবিত্ত জীবন সম্পর্কে বিপুল অভিজ্ঞতা, মধ্যবিত্ত মানুষের প্রতি তাঁর দরদ, তাঁর রচনায় অনিবার্যভাবে পেতে দেরী হয় না।

বস্তুত যে যুগে শরৎচন্দ্রের রচনা বাস্তবতা তীক্ষ্ণ হয়ে তরুণ প্রজন্মকে প্রাণিত করেছিল, সেই যুগ ছিলো অস্থিরতা এবং ঘাত-প্রতিঘাতের যুগ। যুবশক্তি যেন পথহীনভাবে তখন অস্থিরতা এবং অনিশ্চয়তার যন্ত্রণা নিয়ে ব্যর্থতায়, উপেক্ষায় অপরিচিত। শরৎচন্দ্র সেই অস্থিরতা-যন্ত্রণা- ঘাত-প্রতিঘাতকে আত্মস্থ করে যুগযন্ত্রণার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ফুটিয়ে তোলেন তাঁর রচনায়। শরৎচন্দ্রের সমগ্র সাহিত্যসৃষ্টির অন্তর্লীন প্রবণতা সম্পর্কে হরপ্রসাদ মিত্র মন্তব্য করেন —

> সূক্ষ্ম ভাবনা-চিন্তার কাজ তিনি অনেক দেখিয়েছেন, মানুষের অসহায় অবস্থার কারুণ্য ফুটেছে তাঁর অনেক পাত্র-পাত্রীর মধ্যে, সমাজের দোষত্রুটির কথাও তিনি অনেক লিখেছেন। এসব সামগ্রীর দাম কম নয়। তবু মনে হয়, আমরা তাঁর হাত থেকে আরো বড়ো, আরও প্রত্যক্ষ একটি উপহার পেয়েছি — বিদ্যা—বিত্ত—নারী—পুরুষ—ধর্ম—সংস্কার নিরপেক্ষভাবে সাধারণ, সামান্য মানুষের প্রতিদিনের জীবনের পাথেয় রূপে মানুষকে ভালবাসার অসামান্য আদর্শ তিনি পুনরাবিষ্কার করেছিলেন। সেই আবেদনই তাঁর সাহিত্যের চমৎকৃতি। বুদ্ধির চেয়ে বোধিতে তাঁর সহজ আশ্রয় ছিল। তাই শরৎচন্দ্রের আবেদন সরল, এবং ব্যাপক।[৩৫]

আধুনিক প্রগতিশীল চিন্তাধারা, প্রচলিত সমাজব্যবস্থার বিকৃতি উদ্‌ঘাটনে, ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের অন্তর্লীন আদর্শের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাময় আস্থা নিয়ে তাঁর রচনা বারবার প্রমাণ করেছে তিনি যুগসন্ধির, যুগসঙ্কটের শিল্পী। শরৎচন্দ্র তাঁর আধুনিক চিন্তায় আধুনিককালের বাঙালী চরিত্রে আত্মপ্রত্যয়ের অভাবটি লক্ষ করেছিলেন। তাই তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলো যেমন সতীশ, দেবদাশ, জীবানন্দ, শ্রীকান্ত এরা নিজেদেরকে প্রতিকূলতার মুখ থেকে রক্ষা করতে পারেনি, সংসারের প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেনি। এই চরিত্রগুলো প্রকৃতপক্ষে দিশাহীন, হতভাগ্য এবং আধুনিক বাঙালিরই প্রতিনিধিত্ব করেছে।

তবে শুধুমাত্র এইটুকু দিয়ে শরৎচন্দ্রের মূল্যায়ন করলে তা পূর্ণ হয় না। অচলা, কিরণময়ীর মতো নারীসত্ত্বাও জটিল জীবনচেতনার যন্ত্রণায় আর্তবিক্ষুব্ধ। সমকালের অস্থির জীবনচেতনার স্পর্শে শরৎচন্দ্রের শিল্পীদৃষ্টি — জীবনবোধে আলোড়িত। কাজেই শরৎচন্দ্রের লেখায় সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ, প্রেম-ভালোবাসা নিয়ে যে উদ্বেগ তা কখনই তাঁর কল্পনাবিলাস নয় বরং বাস্তবের যথার্থ প্রতিফলন। এই বাস্তব ভাবনার বিচ্ছুরণ লক্ষ করা যায় শরৎ-পরবর্তী অনেকের লেখাতেও। যদিও এই কথার অর্থ এই নয় যে পরবর্তী লেখকগোষ্ঠী মুখ্যত শরৎচন্দ্রের অনুগামী। শরৎচন্দ্রের ভাবধারার অনুসরণে নবীন প্রজন্মের ভাবধারা প্রতিষ্ঠিত এ কথা সম্পূর্ণভাবে সত্য নয় —

> শরৎচন্দ্রের সৃষ্টিপ্রেরণার মধ্যে যে আবেগধর্ম এবং বাস্তব জীবনের দীনতা—হতাশা ও স্খলনপতনের মধ্যেও যে আদর্শ—উপলব্ধির চেতনা পরিলক্ষিত হয় — তা মুখ্যত বাঙালীর সহজাত স্বাভাবিক প্রবণতা। উত্তরকালে বাঙালী লেখকগোষ্ঠীর উপর স্বদেশী ও বিদেশী যত প্রভাবই পড়ুক না কেন, এই প্রবণতাগুলো থেকে অনেকেই মুক্ত নন। এই অর্থে পরবর্তী লেখকগোষ্ঠীর উপর শরৎচন্দ্রের 'সচেতন' বা 'অবচেতন' একধরনের প্রভাব অথবা শরৎচন্দ্রের সঙ্গে এঁদের ভাব-সাদৃশ্য একেবারে অস্বীকার করা যায় না।[৩৬]

পরবর্তীকালে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এই কথার সমর্থনে তার 'সাহিত্যের সত্য' রচনায় স্বীকার

করেন, 'শরৎচন্দ্রের তিরোধান হয়েছে রবীন্দ্রনাথের বর্তমানে, তবুও বাঙালী জীবনের সাহিত্যের ভাবধারায় শরৎচন্দ্রই আমাদের অব্যবহিত পূর্ববর্তী ভাবধারা।' এইভাবে অনেকেই তাঁদের ঋণ রয়েছে – এ কথা স্বীকার করেছেন। এমন কি 'কল্লোলের কুলবর্ধন'[৩৭] বলে যাঁকে আখ্যা দিয়েছেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত এবং বুদ্ধদেব বসু যাঁকে বলেছেন, 'Belated Kallolean'[৩৮] সেই প্রথিতযশা লেখক মানিক বন্দ্যোপধ্যায় তাঁর 'সাহিত্য করার আগে' প্রবন্ধে লিখেছেন, ''স্কুল জীবনেই কয়েকবার 'শ্রীকান্ত' পড়েছিলাম। 'চরিত্রহীন' আমাকে অভিভূত, বিচলিত করেছিল। বোধহয় আট-দশবার বইখানা পড়েছিলাম তন্ন তন্ন করে। বাংলা সাহিত্যের কত দৃঢ়মূল সংস্কার আর গোঁড়ামি যে চুরমার হয়ে গিয়েছিল এই উপন্যাসে। ...শরৎচন্দ্রের কাহিনীতে পতিতা ও অসতীরা চরিত্র হয়েছে, বড় হয়ে উঠেছে তাদের মনুষ্যত্ব, অনুচিত প্রেমও হয়েছে প্রেম। তখনকার অন্য কোনও লেখক এটা পারেন নি।'' শরৎচন্দ্র তাঁর সমগ্র রচনা দিয়ে প্রমাণ করেছেন, স্পষ্ট করে বলেছেন, —

১। পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব সতীত্বের চেয়ে বড়

২। সতীত্বকে আমি তুচ্ছ বলিনে, কিন্তু একেই তার নারী জীবনের চরম ও পরম শ্রেয় জ্ঞান করাকেও কুসংস্কার মনে করি।

শরৎচন্দ্রে এইভাবেই পাওয়া যায় 'কুসংস্কার' সম্পর্কে সচেতনতার মধ্যে তাঁর আধুণিকতা। সমাজের চোখে যারা অসতী, পতিতা এমনকি যারা গণিকাবৃত্তি অবলম্বন করেছে জীবনে কোন সময় — সেই চন্দ্রমুখী, রাজলক্ষ্মী, বিজলী কিংবা সাবিত্রী – এদের জীবনকে বৃহৎ সমাজ-সত্তার অংশমাত্র রূপে না দেখে, নারীত্ব তথা মনুষ্যত্বের আলোয় উজ্জ্বল করে তুলতে চেয়েছেন শরৎচন্দ্র। প্রথাবদ্ধ সমাজ মানসিকতায় এক যান্ত্রিক প্রাণহীন সংস্কার তথাকথিত সতীত্ব। প্রথাগত মূল্যবোধকে অতিক্রম করে শরৎচন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন এক নতুন মূল্যবোধ। যে প্রেম নারীর সমগ্র সত্ত্বাতে প্রোথিত তাই নারীর সতীত্ব। যথার্থ নারী সত্ত্বার সার্থক রূপায়ক শরৎচন্দ্র বঙ্কিমী যুগকে অতিক্রম করে অগ্রসর হয়েছেন নির্দ্বিধায় সম্মুখের আলোর সন্ধানে, 'পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের' জয়পতাকা তুলে ধরার জন্য। আর সামনের পথ জুড়ে দীপ্ত হয়ে আছে 'কল্লোলের কাল'।

'কল্লোল' জগদীশচন্দ্র গুপ্তের অনেকগুলো গল্প প্রকাশ করেছিল। কবি মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বয়সে বড় হওয়া সত্বেও 'কল্লোল' তাঁদের গ্রহণ করেছিল স্বজন হিসেবে। একইভাবে কথাসাহিত্যিক জগদীশ গুপ্তকেও নিজেদের একজন বলে গ্রহণ করতে দ্বিধা করেনি 'কল্লোল'। জগদীশচন্দ্র গুপ্ত সম্পর্কে বারীন্দ্র কুমার ঘোষ 'রোমন্থন' গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন, ''জগদীশ শরৎচন্দ্রেই গোত্রজ, তাঁরি প্রতিভার মানসপুত্র''। অন্যদিকে অশ্রুকুমার সিকদার লিখেছেন —

> কিন্তু মনুষ্যত্ববোধে যে স্থির আস্থা শরৎচন্দ্রে অবিরল তা জগদীশচন্দ্রে নেই। জগদীশচন্দ্র সংশয়ান্বিত, ধ্রুবত্ব বিষয়ে তিনি নাস্তিক। শরৎচন্দ্র মনে করেন নর-নারীর বিড়ম্বনার প্রধান উৎস সমাজ ও দেশাচার, জগদীশচন্দ্র বিশ্বাস করেন মানুষের বিড়ম্বনার প্রধান হেতু অমোঘ নিয়তির অন্ধতা।..... মানুষের মহিমা নয়, তার মহিমাহীনতাই তার রচনায় প্রতিবিম্বিত। দু:খ মানুষের অস্তিত্বের অনিবার্য অঙ্গ, আর এই উপলব্ধিকে জগদীশ গুপ্ত রূপায়িত করেছেন বিদ্রুপপ্রখর ঊনভাষী রচনারীতির বিশিষ্টতায়। জগদীশচন্দ্রের নির্লিপ্তি শরৎচন্দ্রে নেই, শরৎ-রচনার হৃদয়বত্তা জগদীশচন্দ্রে নেই।[৩৯]

জগদীশচন্দ্রের সাহিত্য বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে ড: সুকুমার সেন তাঁর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থে লিখেছেন—

> জগদীশচন্দ্রের ভাবিকতার (আইডিয়ালিজম) মাত্রা খুবই কম, বড় গল্পে

হয়ত একটু-আধটু আছে।...জগদীশচন্দ্রের গল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য কাহিনীর কঠোর দু:খ মমতায় এবং রচনারীতির বিদ্রুপ-ইঙ্গিতপূর্ণ সংক্ষিপ্ত স্পষ্টতায়। অসহায় মানুষের জীবনচক্র ঘুরিতেছে নির্মম নিষ্ঠুর হিংস্র অদৃষ্টের হাতে — ইহাই জগদীশচন্দ্রের গল্পের অমোঘ নির্দেশ। মানুষের দৈন্য-কুশ্রীতা-নোংরামির জন্য জগদীশচন্দ্র সমসাময়িক আধুনিক লেখকদের মত সমাজের বা ব্যক্তির ঔদাসীন্য, ঘৃণা বা লুব্ধতা দায়ী বলিয়া দেখান নাই ...তিনি কিছুকে বা কাহাকে হেতুভূত না করিয়া যে হিংস্র অদৃষ্টশক্তি মানুষের ভাগ্য লইয়া ছিনিমিনি খেলে, তাহার দিকে ইশারা করিয়াছেন।[৪০]

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, 'রবীন্দ্রনাথ, প্রভাতকুমার, শরৎচন্দ্রের যৌথ প্রয়াসে যে সাহিত্যরুচি গড়ে উঠেছিল, সে আবহাওয়ার বিরুদ্ধে প্রথম সার্থক শিল্পী প্রতিবাদ জগদীশ গুপ্ত'। 'প্রতিবাদ'—এর জন্যই যে, রবীন্দ্রনাথ – শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে যেখানে গড়ে উঠেছে মানুষের ওপর অপরিসীম বিশ্বাস, সেখানে মানুষের মনুষ্যত্বে অবিশ্বাস হল জগদীশচন্দ্রের সাহিত্যের মূল কথা। তাঁর লেখা পড়লে প্রচন্ডভাবে আলোড়িত হয়ে ওঠে আমাদের মূল্যবোধ। স্বভাবতই আমাদের অস্বস্তির ঘূর্ণিস্রোতে ঘুরপাক খেতে হয়। অধ্যাপক ভূদেব চৌধুরী লিখেছেন —

কল্লোল সমকালীন লেখকদের মত পুরাতনে কেবলমাত্র অবিশ্বাসই নয়, প্রাচীন বিশ্বাসের আমূল ভিত্তিকে পর্যন্ত গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে বিচূর্ণ করে দেবার এক দুর্দম স্পৃহা নিয়ে যেন আবির্ভূত হয়েছিলেন গল্প শিল্পী জগদীশচন্দ্র। ...সৌন্দর্য, কল্যাণ ও সত্য সম্পর্কে মানুষের যুগ যুগ প্রচলিত নীতিচেতনার প্রতি এক মৌলিক অবিশ্বাসে জগদীশ গুপ্ত একান্ত বিমুখ। ...ফলে কেবল অস্বীকার করেই তিনি তৃপ্ত নন, বিশ্বপ্রবাহের মূলে এক অমোঘ শক্তির অস্তিত্বকে তিনি অনুভব করেছেন, যা একান্তভাবে বিনাশক, ক্রূর এবং কদর্য। ...আর জগদীশ গুপ্তের অনন্য বৈশিষ্ট্য বিশ্বনিয়মের অমোঘ পরিণাম সম্পর্কে তাঁর আত্মিক বিশ্বাসের অবিচল দৃঢ়তায়। এত দৃঢ়তার সঙ্গে বিধাতাকে ঘৃণা করতে পেরেছেন বাংলা কথাসাহিত্যের খুব কম গাল্পিকই। ...এ শৈলীকে কঠিন পাথরের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে, –নিভাঁজ, জমাট, শক্ত এক কালো পাথর, প্রচন্ড আঘাতেও যা ভাঙে না, আর দুমড়োয় না। দুর্মর – দৃঢ় সংবদ্ধ এই রূপ, জগদীশ গুপ্তের আত্মবিশ্বাসের ঘন কাঠিন্যকে তিলতিল আত্মস্থ করেই গড়ে উঠতে পেরেছে। বিশ্বনিয়তির বিভীষিকাময় পরিচয় ও পরিণাম সম্পর্কে অন্ধবিশ্বাস তাঁর পক্ষে একান্ত অভ্রান্ত, প্রায় নিজের অস্তিত্বের মতই। এর বিরুদ্ধে শিল্পীর অনুচ্ছাসিত, কঠিন, যথাযথ তির্যক স্পষ্টোক্তি আসলে তার আহত আত্মার জমাট আক্রোশেরই অপ্রতিহত কাঠিন্য দিয়ে গড়া।[৪১]

কবি মোহিতলাল মজুমদার তাঁর 'বর্তমান বাংলা সাহিত্য' সমালোচনায় লিখেছেন —

...তাঁহার সেই গল্পগুলির কথাই বলিতেছি যাহাতে মানুষের জীবন একটা অতিশয় দয়াহীন, দুর্জ্ঞেয়, দেব–নির্যাতনের রহস্য ঘনাইয়া উঠিয়াছে, মনে হয় জীবনের আলোকোজ্জ্বল নাট্যশালার একপ্রান্তে একটা অন্ধকারময় কোণ আছে, সেখানে একটা নামহীন, আকারহীন হিংস্রতা সর্বক্ষণ ওৎ পাতিয়া বসিয়া আছে, মানুষ তাহারই যেন এক অসহায় শিকার, তাঁহার নিষ্ঠুরতাও এত ভয়ঙ্কর নয় – যত ভয়ঙ্কর তাঁহারই সেই অতিপ্রাকৃত রূপ। যাহাকে আদিম মানবের কুসংস্কার, অথবা বিকারগ্রস্ত রোগীর দু:স্বপ্ন বলা যায় — সভ্য, শিক্ষিত মানুষের সুস্থবুদ্ধি যে সকল ঘটনাকে কল্পনারও বিরোধী বলিয়া মনে

করে জগদীশচন্দ্র তেমন ঘটনাকেও তাঁহার সম্ভবতা নয়– এমন বাস্তবতায় মন্ডিত করিয়াছেন যে, ইংরাজীতে যাহাকে BIZARRE বলে, সেইভাবে আমাদিগকে অভিভূত করে। মনে হয়, আমরা এমন একটি বস্তুর সম্মুখীন হইয়াছি, যাহা মানুষের বুদ্ধি বা জাগ্রত চৈতন্যের অগোচর, সৃষ্টির নেপথ্যে যে পঞ্চভৌতিক শক্তি প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, এ সকল যেন তাহারই ক্বচিৎ সৃষ্টি, আদিম মানুষের অপ্রবুদ্ধ চেতনায় ইহার ছায়া পড়িত। কিন্তু, এখনও সেই সকল অনুভূতি হয়তো আমাদের চেতনার নির্জন স্তরে সঞ্চিত আছে, অতিপ্রাকৃতের সেই বিরাটবেষ্টনী যে এখনও আমাদিগকে ঘিরিয়া রহিয়াছে, নানা ইঙ্গিতে, ইশারায় আমরা সে কথা স্মরণ করিতে বাধ্য হই।[৪২]

জগদীশ গুপ্তের গল্প পাঠ করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও রূপ ও রসের আস্বাদন পেয়েছিলেন। জগদীশ গুপ্তকে সম্বর্ধিত করে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, 'ছোটগল্পের বিশেষ রূপ ও রস তোমার লেখায় পরিস্ফুট দেখিয়া সুখী হইলাম'। অবশ্য তাঁর 'লঘু গুরু' উপন্যাস রবীন্দ্রনাথের রুচিবোধকে আহত করেছিল। এই উপন্যাস পাঠের পরই রবীন্দ্রনাথকে এক দীর্ঘ সমালোচনা করতে হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে জগদীশ গুপ্তের রচনা সম্পর্কে আলোচনার সময় 'লঘু গুরু' উপন্যাস সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অভিযোগ এসে পড়ে অনিবার্যভাবেই। — এই দীর্ঘ সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথের ক্ষোভ ও অস্বস্তি গোপন থাকেনি। তিনি লিখেছেন,

লঘু গুরু গল্প সম্বন্ধে যদি জজিয়তী করতেই হয় তাহলে গোড়াতেই আমাকে কবুল করতে হবে যে, এই উপন্যাসে যে লোক যাত্রার বর্ণনা আছে আমি একেবারেই তার কিছু জানি না। সেটা যদি আমারই ত্রুটি হয়, তবু আমি নাচার। বলে রাখছি, এদেশে লোকালয়ের যে চৌহদ্দির মধ্যে কাটালুম, এই উপন্যাসের অবলম্বিত সমাজ তার পক্ষে সাত সমুদ্র পারের বিদেশ বললেই হয়। দূর থেকেও আমার চোখে পড়ে না।[৪৩]

রবীন্দ্রনাথের জগদীশ গুপ্তের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে আপত্তিগুলোর আড়ালে বৃহত্তর পাঠকের সায় যে আছে তা নিছক অনুমানে পর্যবসিত নয়। নচেৎ জগদীশ গুপ্ত সম্পর্কে আমাদের ঔদাসীন্যের আর যে কোনো কারণ উদ্‌ঘাটন দুরূহ। রবীন্দ্রনাথের রুচিবোধকে 'লঘু গুরু' যে কারণে করেছিল আহত, সাধারণভাবে বাঙালি পাঠকেরাও একই ঐতিহ্যে লালিত হয়ে সহজে গ্রহন করতে পারেনি 'লঘু গুরু'কে। বাংলা সাহিত্যে পতিতা – দু:খিনী বিধবার নামান্তর – তার বিদ্রোহ দেখতে অভ্যস্থ নয় সাধারণ পাঠককুল। প্রচলিত ছকে বাঁধা ধারণাকেই আঘাত করতে চেয়েছেন জগদীশ গুপ্ত তাঁর একাধিক গল্প, উপন্যাসে। তাঁর লেখনীর সঙ্গে ঠিকমতো পরিচিত না হলে তাঁকে ভুল বোঝার সম্ভাবনা সবসময়ই থেকে যায়। কেননা, চমক বা চটক সৃষ্টির আগ্রহ তাঁর নেই। রবীন্দ্রনাথও স্বীকার করেছেন সে কথা। 'লঘু গুরু'র সমালোচনার শেষ পর্যায়ে পৌঁছে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, – 'এই উপন্যাসের বিষয়টি সামাজিক কলুষঘটিত বটে, তবুও কলুষ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করার উৎসাহ এর মধ্যে নেই'।

নির্দেশিকা

১।	সত্যেন্দ্রনাথ রায়	—	বাংলা উপন্যাসে আধুনিকতা	পৃ:	৬১
২।	সত্যেন্দ্রনাথ রায়	—	তদেব	পৃ:	৭৫
৩।	সত্যেন্দ্রনাথ রায়	—	তদেব	পৃ:	৮১
৪।	সত্যেন্দ্রনাথ রায়	—	তদেব	পৃ:	১১৫
৫।	অশ্রুকুমার সিকদার	—	আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস	পৃ:	২
৬।	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	—	রবীন্দ্র রচনাবলী (অষ্টম খন্ড)	পৃ:	২১২
৭।	অশ্রুকুমার সিকদার	—	আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস	পৃ:	১
৮।	গোপিকানাথ রায়চৌধুরী	—	দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য	পৃ:	৩১
৯।	সত্যেন্দ্রনাথ রায়	—	বাংলা উপন্যাসে আধুনিকতা	পৃ:	১১৭
১০।	হরপ্রসাদ মিত্র	—	সাহিত্যের নানাকথা	পৃ:	২৬৬
১১।	সত্যেন্দ্রনাথ রায়	—	বাংলা উপন্যাসে আধুনিকতা	পৃ:	১৩২
১২।	সত্যেন্দ্রনাথ রায়	—	তদেব	পৃ:	১১৮
১৩।	সুকুমার সেন	—	বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস	পৃ:	
১৪।	তপোধীর ভট্টাচার্য ও স্বপ্না ভট্টাচার্য	—	আধুনিকতা, জীবনানন্দ ও পরাবাস্তব	পৃ:	১৪
১৫।	জীবনানন্দ দাশ	—	কবিতার কথা	পৃ:	৭
১৬।	Pablo Picasso	—	Picasso on Picasso	পৃ:	৮৫-৮৬
১৭।	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	—	'বিবেচনা ও অবিবেচনা'– সবুজপত্র বৈশাখ,১৩২১বাং		
১৮।	Ilia Eherenburg	—	The writer and his craft	পৃ:	৫
১৯।	সত্যেন্দ্রনাথ রায়	—	বাংলা উপন্যাসে আধুনিকতা	পৃ:	১৩৭
২০।	উজ্জ্বল কুমার মজুমদার	—	উপন্যাসে জীবন ও শিল্প	পৃ:	৩
২১।	উজ্জ্বল কুমার মজুমদার	—	তদেব	পৃ:	৩-৪
২২।	নরহরি কবিরাজ	—	স্বাধীনত সংগ্রামে বাংলা	পৃ:	২১৫
২৩।	শঙ্খ ঘোষ	—	ভূমিকা-বিজয়ার অলিন্দে	পৃ:	৯
২৪।	Ralph Fox	—	The novel and the people	পৃ:	৮০
২৫।	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	—	কল্লোল যুগ	পৃ:	৫১
২৬।	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	—	তদেব	পৃ:	১৮-১৯
২৭।	তপোধীর ভট্টাচার্য, স্বপ্না ভট্টাচার্য	—	আধুনিকতা, জীবনানন্দ ও পরাবাস্তব	পৃ:	১৭৩
২৮।	রাধাকমল মুখোপাধ্যায়	—	ভারতবর্ষ-সাহিত্য সমালোচনার মাপকাঠি শ্রাবণ সংখ্যা ১৩২৩বাং		
২৯।	ভবানী ভট্টাচার্য	—	কথাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ, কল্লোল শ্রাবণ সংখ্যা ১৩৩৪ বাং		

৩০। বুদ্ধদেব বসু — রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক পৃঃ ১১৮
৩১। বুদ্ধদেব বসু — রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক পৃঃ ১৩২
৩২। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত — কল্লোল যুগ পৃঃ ১১৬
৩৩। সুকুমার সেন — বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস পৃঃ ২৪৯
৩৪। জগদীশচন্দ্র গুপ্ত — কালি কলম, ভাদ্র সংখ্যা ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ
৩৫। হরপ্রসাস মিত্র — সাহিত্যের নানাকথা পৃঃ ২৭০
৩৬। গোপিকানাথ রায়চৌধুরী — দুই বিশ্বযুদ্ধের সমকালীন বাংলা কথাসাহিত্য পৃঃ ১৭৩
৩৭। সত্যেন্দ্রনাথ রায় — বাংলা উপন্যাসে আধুনিকতা পৃঃ ১৫১
৩৮। সত্যেন্দ্রনাথ রায় — বাংলা উপন্যাসে আধুনিকতা পৃঃ ১৫১
৩৯। অশ্রুকুমার সিকদার — আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস পৃঃ ৫৩
৪০। সুকুমার সেন — বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস